দববারি

কিংশুক বিশ্বাস

আজকের মোটোরোলা কোকাকোলার যুগে ক'টা লোক যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনে - তা বোধহয় হাতে গুণেও বলে দেওয়া যায়। কোনো ক্যাসেট বিক্রেতার কাছে খবর নিলেই জানা যাবে যে অন্যান্য যে কোনো ধারার গানের থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্যাসেটের চাহিদা বা কাট্‌তি কত কম। এর কারণ মূলতঃ একটাই - ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের আপাত দুর্বোধ্যতা এবং সাধারণ শ্রোতার ভীতি - এটা নাকি 'কিছু' লোকেই বোঝে এবং শোনে। আজো তাই এই গান কিছুমাত্র 'এলিট্‌' শ্রেণীর শ্রোতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঋত্বিক ঘটকের ছবি, জীবনানন্দের কবিতা বা পিকাসোর জ্যামিতির মতো তাই ক্ল্যাসিকাল মিউজিকও আপামর জনসাধারণের মতে, কিছু 'ইন্টেলেকচুয়াল' শ্রোতার জন্যেই। অনেকদিন আগে, কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এই ভদ্রলোক একটি বই লিখেছিলেন। তার নাম ছিলো 'গীতসূত্রসার'। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, রাগরাগিণী যে লোকে সহসা বুঝতে পারে না তার কারণ রাগরাগিণীর 'দেশগত জাতি বিশেষত্ব।' এই কথাটা ভীষণ মূল্যবান। যে কোনো দেশের যে কোনো উচ্চতার শিল্পধারার (higher form of art) ক্ষেত্রেই এ কথাটা প্রযোজ্য হতে পারে। নতুন কোনো ছাত্র যখন বিদেশী ভাষা শিখতে যায়, তখন তার কাছে পুরো ব্যাপারটাই ভয়ানক দুর্বোধ্য মনে হয়, বিশেষ করে সেই বিদেশী ভাষার বাক্‌-ব্যবহার। রাগরাগিণীর ব্যাপারটাও সেরকম। "অনেক না শুনিলে মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম হয় না।" সরাররি সেই 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থের ১ খণ্ড থেকে উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করলাম। কারণ আমার লেখাটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই statement টার ওপরেই ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আমি নিজেকে কখনোই গানের একজন 'বোদ্ধা' বলে মনে করি না। আমি নেহাৎই একজন শ্রোতা। ছেলেবেলায় লাগাতার রেডিও শোনার অভ্যাস থেকে একটা অ াল্‌গা প্রেম তৈরি হয়ে যায় ক্লাসিকাল মিউজিকের প্রতি। সে বয়সে কিছু বুঝতে না পারলেও শুনতে খারাপ লাগতো না। কিছু না বুঝে স্রেফ্‌ চোখ বুজে শুনে যেতাম চুপচাপ। এমন সময়ে আমার হাতে এসে পড়ে দুটি অত্যন্ত মূল্যবান ক্যাসেট। একটি হলো, বড়ে গোলামের ঠুংরি, আর অপরিটি বেগম আখতারের বাংলা গান--শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথায় ও সুরে। এই দুটি ক্যাসেটকেই শুনতাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বড়ে গোলামের 'আয়ে না বালম্‌' বা আখতারী বাঈয়ের 'কোয়েলিয়া গ ান থামা এবার' আমার মস্তিস্কে শেকড়-টেকড় ঝাঁকিয়ে বসে পড়ে, তার পর থেকে আজো নেশাগ্রস্তের মতো শুনে যাচ্ছি অবিরাম। আমার এই লেখা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে, যাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনার এবং বোঝার বাসনাটুকু আছে, কিন্তু জানা নেই কী শোনা উচিৎ, কেন শোনা উচিৎ। নিজেদের সামাজিক অভিজাত্য বজায় রাখতে যারা সাজুগুজু করে সদলবলে যান 'ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সে', অথবা মাথায় ফুল গুঁজে ভীড় করেন রবীন্দ্রসদনের বাতানুকূল জলসায়, তাদের জন্যে এই লেখা নয়। তাদের এই লেখা না পড়লেই ভালো হয়, কারণ তাদের কাছে গান নিজেদের status এবং সাজসজ্জা প্রদর্শনীর উপলক্ষ্য বিশেষ। এই লেখা পড়ে কেউ যদি বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত শোনার প্রতি সামান্য উৎসাহ ও বোধ করেন, তবে সেটা হবে নিজস্ব, --একান্ত ব্যক্তিগতভাবে দেশজ সংস্কৃতির প্রকাণ্ড বটগাছের কাছে আত্মসমর্পণ, যার মূল প্রোথিত রয়েছে আমাদের গভীর থেকে গভীরতর চেতনায়, বুদ্ধিতে, অমাদের রক্তে উত্তরাধিকারী অহংকারে। এই প্রত্য াবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে, আর চিন্তায়-মননে জড়িয়ে থাকা বিশুদ্ধ সত্ত্বাকে নতুন করে আবিস্কার করার কাজটাও সহজতর হয়ে উঠবে। আমি যেহেতু সঙ্গীতের ওপর তাত্ত্বিক আলোচনা করতে বসিনি, তাই সঙ্গীতের স্বর ও রাগ ভিত্তিক আলোচনায় না গিয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ভালো লাগা - মন্দ লাগার পক্ষই নেব। রাগ - রাগিণীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী সঙ্গীতের ওপর বিশদ আলোচনা নিজের অত্যল্প জ্ঞান এবং এই দুর্মূল্য কাগজের দিনে স্থগিত রাখতে হলো।

লক্ষ্মৌ-এর সঙ্গীত বিশারদ শ্রীরবীন্দ্রলাল রায় একবার বলেছিলেন যে বাংলায় এমন কোনো পত্রিকা আজো তৈরি হয়নি যাতে সঙ্গীতের ওপর তথাকথিত 'দুর্বোধ্য' বা অভিনব আলোচনা করা যেতে পারে। কথাটা বোধহয় সত্যি। তবে এ দোষ বাঙালী জনসাধারণের না হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বড়লোক সম্প্রদায়ের সেটা বিচার করে দেখার বিষয়। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা বা patronage না পেলে কোনো শিল্পের পক্ষেই যে প্রচার ও জনপ্রিয়তা পাওয়াটা অসম্ভবপ্রায়-এ কথা কে না জানে ?

অবশ্য এই জনপ্রিয়তা না পাওয়াটা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে একভাবে যেমন সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে মুষ্টিমেয় বহুদর্শী শ্রোতার মধ্যে, অন্য দিকে তেমনি, এই ঘটনা শাপে বর হয়েছে --একথাও বলা যায়। অত্যধিক প্রচার বা জনপ্রিয়তা পেয়ে গেলে বিশুদ্ধ মার্গরূপটিকে কতোদূর ধরে রাখা সম্ভব হতো, বলা কঠিন। পুজোর প্যাণ্ডেলে অ্যামপ্লিফায়ারে বাজানো মিউজিকের ভিডিও অ্যালবামে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রচারিত হলে তা দু'দিনে সস্তা ও সহজলভ্য হয়ে যেতে বাধ্য। দুষ্প্রাপ্যতা তথা দুর্বোধ্যতার মধ্যে যে কোথাও একটা চাপা অহংকারের গন্ধও থেকে যায়। সুবিধে হিসেবে- যতোটা সম্ভব কম বিকৃতির অবকাশ।

তবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এই আপাত দুবোধ্যতার মূলে শুধুমাত্র যে শ্রোতাদের অজ্ঞানতা বা প্রচারে ব্যর্থতাই রয়েছে তা নয়। বহু সহস্র বছরের অভিজ্ঞতায় যা জমা হয় তা অত সহজে আয়ত্বে আনা সম্ভব নয়। ওস্তাদ বা সঙ্গীত শিল্পীরা কোনোদিন সাধারণ শ্রোতার সঙ্গে গল্প করেননি এ বিষয়ে, কারণ তাঁরা চাননি যে শ্রোতা সর্বজ্ঞ হে াক। যেটা এই সময়ে বেশ দরকারী হয়ে পড়েছে। কারণ গানের বৃত্তির বা জীবিকার যে বংশানুক্রমিক সীমা বা ধারা ছিল, তা এখন আর নেই। ঘরের বাইরের লোক গান নিয়েছেন, কাজেই জীবিকার খাতিরে প্রতারণা এসে পড়েছে - যা ইতিপূর্বে ছিলো না। সে সময়ে গান গেয়ে লোকের মনোরঞ্জন করতে পারার ওপরে গায়কের জীবিকা নির্ভর করতো না, কাজেই গান শিল্পীর স্বাধীনতায় গড়ে উঠেছিলো। অজ্ঞানীর শাসন তাকে তখন কাবু করতে পারেনি। এই উলটোপালটা সময়ে, আমার

তো মনে হয়, খদ্দেরকে যেমন জিনিস সম্বন্ধে সবসময় শঙ্কিত থাকতে হয় --শ্রোতাকেও সেইকম গান সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ অনেক সময়ে বিনামূল্যে পাওয়া গেলেও গানের ভেজালের দুর্ভোগ বড়ো কম নয়, যদিও সহজে তা ধরা পড়ে না। তাই আমার এই লেখা, কী শোনা উচিৎ--এর সঙ্গে সঙ্গে, কী শোনা উচিৎ নয়, এর ওপরও সমান গুত্ব আরোপ করবে -- যা আমি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছি। এতে যদি কোনো 'খ্যাতনামা' শিল্পীকে অপমান করা হয় এবং ফলতঃ কিছু কৃত্রিম ভক্তবৃন্দের বিরাগভাজন হতে হয়--তাহলে কিছু করার নেই। কারণ, আগেও বলেছি, আবার বলছি, এই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, আন্তরিক পাঠকেরকাছে বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত শোনার পথনির্দেশ - স্বরূপ নাতিদীর্ঘ একটি তালিকা তুলে ধরা। এই তালিকা হবে অবশ্যই ঘরানা-ভিত্তিক - প্রথমতঃ কণ্ঠসঙ্গীতের, তারপরে যন্ত্রসঙ্গীতের। সাধারণভাবে সেই সমস্ত নামই আলোচনা করা হবে যাদের রেকর্ড বা ক্যাসেট বাজারে কিনতে পারা যায়। যেহেতু এঁদের অধিকাংশেরই স্টেজ পারফরম্যান্স শোনা আর সম্ভব নয়, তাই নানা মিউজিক স্টোরে সুলভ বা কিঞ্চিৎ দুর্লভ ক্যাসেটের ওপরেই আমাদের নির্ভর করতে হবে।

প্রথমেই বলে নেওয়া যাক যে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দুটি মূল ধারা আছে। প্রথমটি, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত এবং দ্বিতীয়টি দক্ষিণ ভারতীয় অথবা কর্ণাটকী সঙ্গীত হিসাবেই পরিচিত। এই দুই ধারা পরস্পর স্বতন্ত্র হলেও নানা জায়গায়, এমনকী রাগরূপেও অনেক সময়ে এদের মিল বা সাজুজ্য পাওয়া যায়। সে যাই হোক, এই স্বল্প পরিসরে আপাতত আমাদের আলোচনা উত্তর ভারতীয় কণ্ঠসংঙ্গীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হোল।

উত্তর ভারতীয় কণ্ঠ সঙ্গীত
ঘরানা ভিত্তিক বিভাজনের আগে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া দরকার কণ্ঠসংগীতের কতোগুলি প্রকার আছে. সাহিত্যে যেমন আমরা উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি শাখা ও উপশাখার সঙ্গে পরিচিত সঙ্গীতেও তেমনিগঠন ও পরিবেশনের ভিত্তিতে কয়েকটি শাখা ও উপশাখা রয়েছে, যেগুলি ক্ল্যাসিকাল বা শাস্ত্রীয় এবং লাইট্ ক্ল্যাসিকাল বা উপশাস্ত্রীয় সঙ্গীত - এ দুই ধারা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পুরো ব্যাপারটাকে দুটো flow chart -এর সাহায্যে দেখা যাক।

শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত
ধ্রুপদ / ধামার সাদ্‌রা খেয়াল তারানা সরগমগীত টপ্‌খ্যাল

লঘুশাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত
দাদ্‌রা চৈতা কাওয়ালি ভজন
ঠুংরী কাজরী সাওন গজল টপ্‌পা

এগুলি ছাড়া আরো বিভাগ আছে - সব মিলিয়ে পঞ্চাশটি বিভাগের কথা কণ্ঠসঙ্গীতে আলোচনা করা হয়। তবে তারঅনেকগুলিই আজকাল লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায়। কণ্ঠসঙ্গীতের এই বিশাল ব্যাপ্তি একটি মানচিত্র গঠন করেছে যাকে অনুসরণ করে যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার গঠনগত শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করেছে। আর এই কারণেই আমরা আমাদের আলোচনা কণ্ঠসঙ্গীতকে নিয়েই শু করেছি। উপরি উক্ত ধারাগুলি মধ্যে আমরা ধ্রুপদ, খেয়াল ঠুংরী-দাদ্‌রা ও টপ্‌পার মধ্যেই আপাতত ঘোরাঘুরি করবো। ধ্রুপদ-ধামারের স্থান খেয়ালে ওপরে হলেও পাঠকের সুবিধার্থে আমরা খেয়াল দিয়েই আমাদের আলোচনা শু করবো
বর্তমান সঙ্গীত বিচরণক্ষেত্রে খেয়ালই সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ ধারা। খেয়াল গানের বিস্তৃতি এতো ব্যাপক আর রঙিন যে একেকজন শিল্পী একেকরকম ভাবে এর রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এই স্টাইল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘরানা-নিয়ন্ত্রিত, আবার কখনো শিল্পীসত্ত্বার স্বতন্ত্র প্রকাশ। খেয়াল গানের এই নমনীয়তা বা flexibility -ই তাকে বর্তমান সঙ্গীতের জনপ্রিয়তম রূপটি দিয়েছে। আনুমানিক ষোড়শ শতকে উদ্ভাবিত এই ধারাটিকে ধ্রুপদের তুলনায় 'আধুনিক'ই বলা চলে। খেয়ালের গঠনগত আলোচনা এখানে করা গেল না। অকারণ 'বোল আলাপ', 'বোল তান', 'বোল বাট্', 'আওচার', 'জমজমা' ইত্যাদি জটিল শব্দভার আক্রান্ত না হয়ে আমরা সরাসরি ঢুকে পড়ি উত্তর ভারতের ঘরনা ও দরবারের শরীরে।

খেয়াল ঃ প্রধান ঘরানাগুলি--
'ঘরানা' শব্দটি যে হিন্দী শব্দ 'ঘর' থেকেই -- একথা সবাই জানি আমরা। এই ঘরানা সঙ্গীতই ভারতীয় সঙ্গীতকে অন্যান্য সঙ্গীতের থেকে আলাদা করে রেখেছে। পরিবার বা family কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই সঙ্গীতশিক্ষার ধারণা। গু - শিষ্য পরিবহনে বংশ পরম্পরাকে ধরে রাখা হয়েছে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে। একই ঘরের শিল্পীদের গায়নরীতি মোটামুটিভাবে এক, --যা অন্য ঘরের শিল্পীদের থেকে স্বভাবতই পৃথক। খুব কম এমন উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে বাইরের কেউ ঘরের তালিম পাচ্ছে। এই শিক্ষা পেতে গেলে পরিবার ভুক্ত হওয়াটা আবশ্যিক ছিলো। পণ্ডিত রবিশংকর মাইহার ঘরানায় এসেছিলেন বাবা আলাউদ্দিনের কাছে তালিম নিতে, তবে তাঁকে ওস্তাদের কন্যার সঙ্গে বিবাহ করতে হয়েছিলো । আবার গু নিসার হুসেনের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ার অপরাধে রশিদ খানকে যে রামপুর ঘরানা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো এবং ওস্তাদের তালিম পাওয়া বন্ধকরে দেওয়া হয়েছিলো -- এ গল্পও হয়তো অনেকের জানা। যা হোক, খেয়াল গানে যে কটি ঘরানার নাম আমরা পাই, তার মধ্যে প্রধান ঘরানাগুলি হলো --'আগ্রা', 'গোয়ালিয়র', 'জয়পুর', 'রামপুর', 'পাতিয়ালা', 'ইন্দোর', 'ভেণ্ডির বাজার', 'মেওয়াটি' ইত্যাদি। এদের সবচেয়ে প্রাচীন ঘরানা দুটি হলো --- 'গোয়ালিয়র' ও 'আগ্রা'। অনেকের মতে, সঙ্গীতের সমস্ত ঘরানারই উৎপত্তি ঘটেছে গোয়ালিয়রের পেট থেকে। আধুনিক কালে, অর্থাৎ এই দশকের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়িকিকিন্তু গড়ে উঠেছে 'কিরানা' যরানাকে ঘিরেই। যতো দিন যাচ্ছে মানুষের জীবন ততো জটিল হচ্ছে আর সেই সঙ্গে ভারতীয় রাগ সঙ্গীত ঠিক উল্টো পথে হাঁটছে। অর্থাৎ ভারতীয় রাগসঙ্গীত (মুলতঃ খেয়াল) ক্রমশঃ সহজ থেকে সহজতর পদ্ধতিতে পরিবেশিত হচ্ছে। 'কিরানা' ঘরানার ঢিল বুনোট আর সহজসাধ্য 'লিরিসিজ্‌ম' --এর জন্যেই এই স্টাইল আজ সবচেয়ে জনপ্রিয়। আমাদের আলোচনা 'গোয়ালিয়র', 'আগ্রা', 'জয়পুর', 'কিরানা', 'রামপুর','পাতিয়ালা' ---এইভাবে সাজালেই অধিক যুক্তিযুক্ত হতো। তবে জনপ্রিয়তার কথা ভেবে, আর সহজবোধ্যতার কথামাথায় রেখে আমাদের 'কিরানা'ই প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত। বয়সের দিক থেকে 'কিরানা' ঘরানা 'গোয়ালিয়র' বা 'আগ্রা'র তুলনায় অর্বাচীন হলেও এবং এতে 'জয়পুরে'র জটিলতা, 'আগ্রা'র খানদানী আভিজাত্য বা 'গোয়ালিয়রে'রবি শুদ্ধ রাগদারী ততোটা না থাকলেও 'কিরানা'র স্টাইলের একান্ত নিজস্ব melody খুব সহজেই শ্রোতাকে আকর্ষণকরে, যার সুরেলা প্রভাব অগ্রাহ্য করা ভীষণ কঠিন।

'কিরানা' ঘরানা

‘কিরানা’ ঘরানার গায়কী কোমল, মূলতঃ কণ, মর্মস্পর্শী...এরকম কতোগুলো বিশেষণ এই স্টাইলেতর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। এই ঘরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, খেয়ালের শুতে যে বিলম্বিত আলাপ থাকে--তাতে ‘ও’ স্বরের অত্যধিক ব্যবহার, --ফলতঃ, একধরণের চক্রাকার আবর্তনের রূপ নেয়। স্বর ও শ্রুতির ব্যবহারের ওপর এই ঘরানায় সর্বাধিক গুত্ব আরোপ করা হয়, আর তাই কণ্ঠস্বরের অনুরণন--যাকে সঙ্গীতের পরিভাষায় বলা হয় ‘অনুনাদ’--তা অপূর্ব এক পরিবেশ (atmosphere) সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। এই বৈশিষ্ট্য একান্তভাবে এই ঘরানার নিজস্ব সম্পদ। ‘বোল-আলাপ’-এর সময়ে নানা শব্দকে ব্যবহার করে থাকেন এই ঘরের শিল্পীরা, এবং এটা সহজেই অনুমেয় যে স্বরবর্ণের চেয়ে ব্যঞ্জনবর্ণের অনুরণন অনেক সহজ--কারণ এতে অনেক কম দমের প্রয়োজন, তাছাড়া এই বিলম্বিত আলাপ শুনতেও বেশ ভালো লাগে, অর্থাৎ অনেক বেশি ‘ন্দ্বন্দ্রন্দ্রন্দ্বন্তুব্ধন্লন্দ্ব’ হয়। এই ঘরানার শিল্পীরা স্বচ্ছেন্দে খেয়ালের পাশাপাশি ঠুংরী, ভজন ইত্যাদি গেয়ে থাকেন এবং এটা লক্ষণীয় যে, ‘কিরানা’ ঘরের ঠুংরী, এই ঘরের খেয়ালের অনেকটা কাছাকাছি -- কারণ উত্তর ক্ষেত্রেই অনুভূতি এবং শিল্পীর স্বকীয়তা এক ভিন্নতর মাত্রা ও রং এনে দেয়। এই বিশেষ factor টিকেই শ্রী অশোক রানাডে বর্ণনা করেছেন-- ‘স্প্লন্দ্বস্তুপ্তপ্ত ন্দ্বপ্পস্বন্ধন্লন্দ্বক্লন্মন্দ্মজস্ক্সন্তুড়’ হিসেবে। ‘কিরানা’ ঘরানার শিল্পীদের প্রথম থেকে মন দিয়ে না শুনলে এ জিনিস উপলব্ধি করা কঠিন। অন্যান্য ঘরানার থেকে এইঘরানার গায়কীর অন্যতম বৈসাদৃশ্য হলো, এই ঘরের শিল্পীদের বিলম্বিত (অনেক সময়ে অতি বিলম্বিত) লয়ে রাগ বিস্তারের প্রতি অনুরাগে। শীতকালের অলস দুপুরগুলোর সঙ্গে যেন এই ঘরানার গায়কীর খুব মিল--কোনো কাজ নেই, তাই ধীরে সুস্থে নরম রোদ্দুরে গা সেঁকা ! ‘কিরানা’র শিল্পীদের এই বিশেষ ঝোঁকটির জন্যে এঁদের রাগরাগিণীর পছন্দের তালিকাটাও বেশ সীমিত। ‘কিরানা’ ঘরের পেটেন্ট রাগগুলো হলো -- ‘কল্যাণ’, ‘পুরিয়া’, ‘লতি’, ‘দরবারী’, ‘মিয়াঁ কি তোড়ি’, ‘আভোগী কানাড়া’ ইত্যাদি। অর্থাৎ বুঝতেই পারা যাচ্ছে -- যে সমস্ত রাগ এই ঘরে গাওয়া হয় -- তার প্রায় সবই ‘আলাপ যোগ্য রাগ’ --এই শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ তানকর্তবের সুযোগ যেখানে স্বভাবতই খুবকম। আর তাই একতাল এবং ঝুমরাতেই এই ঘরের শিল্পীরা বিলম্বিত বন্দিশ গেয়ে থাকেন।

এই ঘরানার দুজন প্রবাদপ্রতিম শিল্পী দুটি পৃথক ধারার জন্ম দিয়েছেন।* প্রথম জন হলেন ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর দ্বিতীয়জন ওস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ খাঁ শেষোক্তজনের প্রতিষ্ঠিত ‘কিরানা’ গায়কীই অনুসরণ করতেন ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেব। তবে আবদুল করিম খাঁর শিষ্য-শিষ্যারাই ‘কিরানা’র সর্বকালের সেরা শিল্পী হিসেবে পরিচিত।

আবদুল করিম খাঁ

ভারতবর্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে ইনি অন্যতম। করিম খাঁ সাহেবের গায়কী থেকেই ‘কিরানা’ ঘরানার উৎপত্তি। ‘চেয়ারম্যানস্ চয়েস্’ নামে এইচ.এম.ভি. থেকে যে ক্যাসেটের সিরিজ বেরিয়েছিলো (বর্তমানে তা ‘অজ্ঞাত’ কোনো কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে), তাতে আবদুল করিমের প্রথম দিকের, অর্থাৎ যৌবন বয়সের কিছু গান রাখা হয়েছিলো--বেশিরভাগই ১৯০৭ / ১৯০৮ সাল নাগাদ রেকর্ড হয়েছিলো সেই সমস্ত খেয়াল। সেগুলি শুনলে আবদুল করিমের প্রকৃত গায়কী সম্পর্কে আন্দাজ করা কঠিন। কারণ সেই সব গান খাঁ সাহেবের প্রথম জীবনের অসাধার ণতানকর্তবের পরিচায়ক--যা তাঁর পরবর্তী জীবনে ক্রমশঃ বর্জিত হয়েছিলো, অত্যন্ত সচেতনভাবে। যৌবন বয়সে রেকড করা ‘সারং সাদ্রা’, ‘সারং তারানা’, ‘গৌড় সারং’, ‘সুঘরাই’ (যা রেকর্ডে ‘সুগ্রী’ নামে নির্দেশিত ছিলো) --খাঁসাহেবের অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তান করার দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু এই ‘স্পিড্’ এবং বন্দিশ নিবেদনে চাঞ্চল্য খাঁ সাহেবের পরিণত বয়সে আর পাওয়া যায় না। সুপরিকল্পিত ভাবে এক ধরণের কোমল, সিক্ত, সুরে-সুরে মাখানো গায়কী চলে এলো আবদুল করিমের কন্ঠে-- যার প্রভাব আজকের শ্রোতাদের পক্ষেও এড়ানো অসম্ভব। আরতাই ‘কিরানা’র এই গায়কীই আজো অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে বেঁচে আছে। এই যে পরিবর্তন খাঁ সাহেব অবলম্বন করেছিলেন -- তা খুব সম্ভবতঃ ওঁর জন্মস্থান কিরানা ছেড়ে মহারাষ্ট্র চলে আসার ফলে। ‘কিরানা’ গ্রামটি পঞ্জাবের কুরুক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থিত ছিলো এবং এই জায়গার নাম থেকেই এই ঘরানার নাম এসেছিলো -- একথা আর বলতেহয় না। প্রসঙ্গত্রমে, একথা আর বলতে হয় না। প্রসঙ্গত্রমে, এ কথাও জানিয়ে রাখি যে, খাঁ সাসেব তাঁর প্রথম জীবনে ‘বরোদা’র রাজদরবারের সভাগায়ক ছিলেন এবং সে সময়ে শোনা যায় তিনি গান গাওয়ার পাশাপাশি সারেঙ্গী এবং বীণাও বাজাতেন অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে। উৎসাহী পাঠকের অবগতির জন্যে জানাই খাঁ সাহেবের জীবনের নানা রঙীন ও ঘটনাবহুল অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৭৩ সালে মুম্বাই নিবাসী জয়ন্তীলাল জারীওয়ালা একটি বই লেখেন--নাম, ‘ট্রস্তুস্তুপ্ত ব্রক্তনপ্প নক্ক, বড়ন্দ স্থক্ক স্নন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব বন্প্লন্দ্বন্দ্ব’.বইটি এখনো খোঁজ করলে পাওয়া যায় বলে আমার ঝিাস। আবদুল করিম খাঁর জীবন সম্পর্কে এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করার অবকাশ নেই, তাই আমরা এবার চলে আসি খাঁ সাহেবের অবিস্মরণীয় কিছু খেয়ালের তালিকায়। এগুলি সবই প্রকাশিত হয়েছে এইচ.এম.ভি থেকে ‘ট্রপ্তুব্ধন্দ্বন্দন্স্তু গুস্সপুস্তু এই সিরিজের তিনটি ক্যাসেটে।***

বসন্ত ললিত যোগিয়া গুজরী তোড়ি
ভীমপলশ্রী মারওয়া তারানা শংকরা মিশ্র জংলা
দেব গান্ধা পট্দীপ শুদ্ধ কল্যাণ মিশ্র কাফি
আনন্দ ভৈরবী আভোগী কানাড়া ঝিঝোঁটি দরবারী কানাড়া
বিলাবল ভৈরবী ঠুংরী শুদ্ধ পিলু তিলং ঠুংরী
সরপদা গারা ঠুংরী মালকোষ হিন্দোল

*‘কিরানা’ ঘরানার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বীণাবাদক ওস্তাদ বন্দে আলি খাঁর নাম পাওয়া গেলেও এই ঘরানার গায়কী নির্ধারণ করেছে এই দুজনই-- আবদুল করিম এবং আবদুল ওয়াহিদ।

***আবদুল করিমের কন্ঠে ভৈরবী ঠুংরী ‘যমুনা কে তীর’, তো আজ ইতিহাস। গোয়ালিয়রের রহমত খাঁর কন্ঠেও এই গানের রেকর্ড ছিলো। আবদুল করিমের ‘বসন্ত’ রাগে। বিলম্বিত খেয়াল ‘অব্ ম্যাঁয় নে মন দেখে’ এবং একই রাগের দ্রুত বন্দিশ ‘ফাগুয়া ব্রিজ দেখেন কো’ -- সেও একপ্রকার অভিজ্ঞতা। ‘যোগিয়া’র ‘পিয়া কে মিলন কি আস’এব ‘ঝিঝোটি’, রাগে আধারিত ঠুংরী ‘পিয়া বিন নহী আওত চ্যায়েন’ --এক কথায় অনবদ্য।

হীরাবাই বারোদেকর

ইনি আবদুল করিম খঁ সাহেবের কন্যা, এবং ‘কিরানা’ গরানার সম্ভবতঃ সবচেয়ে প্রতিভাবান শিল্পী। একটা সময় ছিলো যখন হীরাবাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিলো। হীরাবাইয়ের দূর্ভাগ্য, ইনি বাবার কাছে প্রায় কিছুই তালিম পাননি। ওঁর যাবতীয় সঙ্গীতশিক্ষার তালিম এসেছিলো ‘কিরানা’র অপর স্থপয়িতা অ

াবদুল ওয়াহিদ খাঁর কাছ থেকে। তবে হীরাবাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন পিতার সকণ, মেদুর কণ্ঠ--যা একান্তভাবে হীরাবাই ও তাঁর 'ন্দ্রন্দ্বপ্লন্দ্লন্দ্ব' কণ্ঠকেই চিনিয়ে দেয়, যাকে 'লাস্য' রসাত্মক গায়কী--এইভাবে বর্ণণা করা হয়েছে। পরবর্তী মহিলা শিল্পীদের কাছে পঞ্চাশের দশকের এই সুমিষ্ট গায়কী ভীষণ সত্রিয়ভাবে একটি '**role model**' হিসাবে কাজ করেছে। আশ্চার্যের বিষয় এই যে, হীরাবাই তাঁর যৌবন বয়সে তেমন নাম করতে পারেননি---যে খ্যাতি ও যশতিনি পেয়েছিলেন পরিণত বয়সে এসে। পিতা 'কিরানা' গ্রাম ছেড়ে যে বছর মহারাষ্ট্রের 'মিরাজ' -এ এসে অশ্রয় নিলেন, তার সাত বছরের মধ্যে হীরাবাইয়ের জন্ম হয় (১৯০৫ সালে)। কেন যে তিনি বাবা আবদুল করিমের তালিম বিশেষনা পেয়ে আবদুল ওয়াহিদ খাঁর সম্পূর্ণ তালিম পেয়ে ছিলেন--- তা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ এখানে বিশেষ নেই। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, হীরাবাইয়ের দাদা সুরেশবাবু মানেও বোন হীরাবাইকে অনেক দিন ধরে তালিম দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হীরাবাই আনন্দের সঙ্গে ঠুংরী, ভজন ইত্যাদি রেকর্ড করেছেন, এমনকী মারাঠী মঞ্চে তাঁকে অভিনয় করতেও দেখা গেছে। হীরাবাইয়ের গাওয়া কিছু উল্লেখয়োগ্য রাগ হলো---

মূলতানী সারং দূর্গা
ইমন বৃন্দাবনী সারং তিলক কামোদ
আহীর ভৈরব পট্‌দীপ ভৈরবী ঠুংরী
তোড়ি মারওয়া-তারানা পুরিয়া কল্যাণ
দেশ্‌কার ভূপ বাগেশ্রী

রোশনারা বেগম

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠতানাইয়াৎ - দের মধ্যে অন্যতম। তানকর্তবে রোশনারা বেগম নিঃসন্দেহে জয়পুরের কেসরবাই অথবা মোঘবাইয়ের থেকে এগিয়ে থাকবেন। এতো দ্রুত স্পিডে তান করতে আমি অন্ততঃ অন্য কোনো মহিলা শিল্পীকে শুনিনি। আমার প্রথম থেকেই মনে হয়, রোশনারা বেগমের তান একদম অন্যপথ দিয়ে ছোটে-অর্থাৎ, প্রচলিত রীতির থেকে যেন একটু সরে এসে চলতে থাকে সেই তানের গতি। চাচা আবদুল করিম খাঁ সাহেবের কাছে সম্পূর্ণ তালিম পেয়েছিলেন রোশনারা বেগম। ইনি খুব অল্প বয়সেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। ওঁর ৮/৯ বছরের রেকর্ডও আছে -- তা শুনে শিল্পীর দক্ষতা ও পরিনত শিক্ষা ও 'তৈয়ারি' সম্পর্কে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। পরবর্তীকালে রোশনারা বেগম পাকিস্তানে পাকাপাকিভাবে বাস করতে শু করেন। ওঁর 'বসন্ত' রাগে গাওয়া 'ফাগুয়া ব্রিজ দেখন কো' শুনলেই শিল্পীর পারদর্শিতা ও সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় মিলবে। ওঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খেয়াল--

মা সারং কর্ণাটকী পূবর্বী
আড়ানা মালকোঁষ কেদারা

গাঙ্গুবাই হাঙ্গাল্‌ ঃ

এই যুগের প্রবীন শিল্পী ভীমসেন যোশীর যারা ভক্ত -- তাদের গাঙ্গুবাই হাঙ্গলের গান ভালো লাগবে। ভীমসেনের গায়কী,স্বর ছোঁওয়ার পদ্ধতি-- গাঙ্গুবাইকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ভামসেন যোশীকে নিজের বাড়িতে রেখেতালিম দিয়ে গেছেন গাঙ্গুবাই হাঙ্গল। এঁর আসল নাম গান্ধারী হাঙ্গল। ইনি আবার তালিম পেয়েছিলেন আবদুল করিমের জ্যেষ্ঠ শিষ্য পণ্ডিত সওয়াই গন্ধর্বর কাছে। তবে তার আগে গাঙ্গুবাইয়ের তালিম আসে মা অম্বাবাই ও কাকা রামরাও হাঙ্গলের কাছ থেকে। কিন্তু সওয়াই গন্ধর্বই গাঙ্গুবাইয়ের প্রধান গু, এবং ওঁর কাছ থেকেই গাঙ্গুবাই 'কিরানা' গানের শিক্ষা পান। গাঙ্গুবাইয়ের গলায় এক ধরণের পুষালি বলিষ্ঠতা আছে--যা আমরা ওঁর ছাত্র ভীমসেন যোশীর গানেও পেয়ে থাকি। অথচ গাঙ্গুবাইয়ের কণ্ঠ তাঁর প্রথম জীবনে এতো ওজনদার ছিলো না। সেসময়ে ওঁররেকর্ড করা রাগগুলি যেমন--

দেশ্‌কর দুর্গা কামোদ-তারানা
খম্বাবতী বাগেশ্রী মালকোঁষ
মিয়াঁ মল্লার যোগিয়া ভৈরব
ভূপালী মারওয়া হিন্দোল--
শুনলে গাঙ্গুবাইয়ের প্রকৃত কণ্ঠের, অর্থাৎ যে পুষালি কণ্ঠ বৈচিত্র্যর খাতিরে তাঁর খ্যাতি -- তার পরিচয় পাওয়া যাবে না। গাঙ্গুবাইয়ের পরিণত বয়সের রেকর্ডে আমরা পাই--
আশাবরী দেবগিরি ইমন
চন্দ্রকোঁষ জয়জয়ন্তী আভোগী--(এইচ. এম. ভি)
এবং বেহাগ বাগে--- ('মিউজিক টুডে')
সাওয়াই গন্ধর্ব
এর প্রকৃত নাম রামভাউ কুন্দগোলকর।

সুরেশবাবু মানে

আবদুল করিম খাঁর পুত্র এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই পিতার নরম, কণ ও সুরেলা কণ্ঠের অনেকটাই পাওয়া যায় সুরেশবাবুর গানে। আবদুল করিমের গায়কীর যাবতীয় রস এঁর কণ্ঠে মজুদ থাকলেও খেয়ালে এঁর 'ঠাহরান' কিঞ্চিৎকম ছিলো। আর সেই কারণেই সুরেশবাবু ঠংরী ও ভজনই গেয়েছেন বেশি। ঠুংরী গানে তো এঁর গান আর আবদুল করিমের গানের মধ্যে পার্থক্য করাটাই মুশকিল হয়ে পড়ে। খুবই দুঃখের বিষয় ইনি বেশি রেকর্ড করেননি, কারণ ইনি সারাজীবন অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর কাছেই শিক্ষা পেয়েছেন হীরাবাই, সরস্বতী রানে, গাঙ্গুবাই--প্রমুখেরা। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ হেন দরদী কণ্ঠের শিল্পীর খুব বেশি গান শুনতে পাই না। যে কটি গান সুরেশবাবুর রেকর্ডে পাওয়া যায়, সেগুলি হলো--দাদ্‌রা, ভৈরবী ঠুংরী, খামাজ ঠুংরী এবং তিলং ঠুংরী।

ভৈরবী ঠুংরীর সবচেয়ে জনপ্রিয় গান 'বাজুবন্দ খুল খুল যায়ে' অনেকেই রেকর্ড করেছেন। তেমন, আগ্রার ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, পাতিয়ালার বড়ে গোলাম আলি, ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খাঁ। তবে এঁদের পাশাপাশি সুরেশবাবুর ঠুংরী শুনলে শ্রোতারা বুঝতে পারবেন --কীভাবে ঘরানার তালিমের ওপর নির্ভর করে একই গানের চেহারা আস্তে আস্তে পাল্টে যায়। সুরেশবাবুর গাওয়া দাদ্‌রা 'বান ন্যায়নোঁকা জালিম', অথবা তিলং ঠুংরী 'পিয়া তিরছি নজরিয়া' প্রকৃত অর্থেই 'কিরানা'র ছাপ ও গন্ধ বহন করে।

স্বরস্বতী রানে

আবদুল করিম খাঁ সাহেবের অন্য এক কন্যা সরস্বতী রানে কেন যে নাট্যসঙ্গীতেই রয়ে গেলেন, নিজেকে সেভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দরবারে প্রকাশিত হতে দিলেন না--তা রহস্য। অথচ বোন হীরাবাইয়ের সমান দক্ষতা এঁর কণ্ঠে ছিলো। লিম ছিলো সেই তামিল ও তৈয়ারীও। হীরাবাই, ও সরস্বতী রানের যুগলবন্দী গানের রেকর্ড পাওয়া যায় এইচ.এম ভি.থেকে। সম্প্রতি সেটি ক্যাসেটেও বাজারে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। দুই বোন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে গেয়েছেন রাগ 'বসন্ত বাহার'। এছাড়াও এইচ. এম. ভি.র 'গুজ্জন্দ্বব্ধ প্তুত্তপ্নন্দ্রব্জনন্দ্বন্দ' সিরিজে সরস্বতী রানের যে দু'টি গান পাওয়া যায়, তা হলো--হোরি ('চলো সখী খেলে') সারং ('ন বোলো শাম')

ভীমসেন যোশী

ভীমসেন যোশী 'কিরানা' ঘরানার প্রবীণতম শিল্পী যিনি আজো বহন করে চলেছেন 'কিরানা'র সুপ্রাচীন উত্তরাধিকার। সওয়াই গন্ধর্ব ও গাঙ্গুবাই হাঙ্গলের কাছে তামিল পেলেও ভীমসেন যোশী গত দশ বছর ধরে যে গান করেছেন--তাতে 'কিরানা'র প্রভাব বড়ো একটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শিল্পীর স্বকীয়তা যেখানে ঘরানার কড়াকড়ি নিয়মের বাইরে বেরিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় -- সেরকম ঘটনার এক উদাহরণ ভীমসেনের সঙ্গীত। আজকের যুগেও তণ প্রজন্মের কাছে উনি জনপ্রিয়। নিজেকে যুগোপযোগী করে তোলার পাশাপাশি স্বীকার করে নিয়েছেন অন্যান্য ঘরানার উল্লেখযোগ্য প্রভাবকেও। আত্মীকৃত করেছেন দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের নানা অঙ্গ, জয়পুর বা আগ্রার কিছু কিছু সম্পদ। সব মিলিয়ে হয়ে উঠেছে সম্পূর্ন ভিন্ন, নতুন এক গায়ন শৈলী। যা একান্তভাবেই ভীমসেন যোশীর গায়কী। সওয়াই গন্ধর্বের রেকর্ড করা 'সুহা কানাড়া' রাগে 'তু হ্যায় মোহম্মদ সা'র পাশাপাশি ওই একই গান' ভীমসেনের গলায় শুনলে বুঝতে পারা যাবে, কতো সচেতনভাবে ভীমসেন যোশী সরে এসেছিলেন পুরাতন সেই 'কিরানা' শৈলী থেকে। সঙ্গীতের প্রতি নিবেদিত প্রাণ প্রবীণ ভীমসেন যোশী আজো যে আমাদের মধ্যে আছেন তাঁর উপস্থিতের উষ্ণতাটুকু নিয়ে --তা আমাদের একান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। এইচ.এম.ভি থেকে প্রকাশিত ভীমসেন যোশীর গাওয়া উল্লেখযোগ্য রাগগুলি হলো---

গৌড় সারং শুদ্ধ কেদার সুর মল্লার

ছায়া মল্লার আভেগী দূর্গা

কলশ্রী যোগিয়া সুহাকানাড়া

মারওয়া শুদ্ধ কল্যান মিয়াঁ মল্লার

দরবারী জয়জয়ন্তী ইমন

ভামসেন ঠুংরী ও ভজন ও গেয়েছেন অত্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে। ওঁর যোগিয়া ঠুংরী 'পিয়া মলন কি আস্', মিশ্র কাফিতে বাঁধা ঠুংরী 'পিয়া তো মানত নহী' সেই প্রমানই প্রতিষ্ঠা করে। ওঁর গাওয়া ভৈরবী ভজন 'যো ভজে হরি কো সদা' তো রীতিমতো জনপ্রিয়। তবে একথা বলতে বাধা নেই যে, আবদুল করিমের গাওয়া গারা ঠুংরী 'রসকে ভরে তোরে ন্যায়েন' এবং ভৈরবী ঠুংরী 'যমুনা কে তীর' ভীমসেন যোশীও রেকর্ড করেছেন--কিন্তু ভীমসেনের গান স্বাভাবিককারণেই আবদুল করিমের সকণ কণ্ঠের ঠুংরীর ধারে কাছেও আসতে পারেনি। আসলে কিছু কিছু 'ন্ধ্রস্তুপ্পব্জন্স' সব রকম শিল্পেই স্থাপিত হয়ে যায়, যাদের ভাঙা কোনো শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয় না। অবশ্যই ভীমসেন এখনো নিজেকে সামান্য একজন সঙ্গীতের পূজারী হিসেবেই ভাবেন -- কোনোরকম অহংকার ছাড়াই গেয়ে চলেন স্বভাবসিদ্ধ আত্মস্থ ভঙ্গিতে। এ হেন শিল্পীকে আমরা আর কতোদিন আমাদের মধ্যে পাবো--তা নিয়ে ভয় হয়। পক্ষাঘাতে জর্জরিত এই বর্ষীয়ান সঙ্গীতজীবনের দীর্ঘায়ু কামনা করা ছাড়া আর কীই বা করতে পারি আমরা।

ফিরোজ দস্তুর

'কিরানা' ঘরানার আরেক প্রবীন শিল্পী ফিরোজ দস্তুর। ইনি আজও জীবিত এবং অল্প হলেও সশরীরে গান গাইছেন এখনো। আমীর খাঁ সাহেবের মতো 'কিরানা' ঘরানার একমাত্র 'torch bearer' হিসেবে ফিরোজ দস্তুরের নামই করতে হয়। একথা সত্যিও, যে 'কিরানা' গায়কীর ধারাকে ধরে রাখার ব্যাপারে ভীমসেন যোশীর থেকে ফিরোজ দস্তুরই এগিয়ে থাকবেন। 'কিরানা'র পেলবতা, মেদুরতা আর তরল 'lyrical approach'এসবই পুরোমাত্রায় পাওয়া যায় ফিরোজ দস্তুরের গানে। ওঁর খুব অল্প বয়সে গাওয়া দুটি মাত্র রেকর্ড পাওয়া যায় এইচ.এম.ভি.'র ক্যাসেটে--আড়ানা ও কেদার। এছাড়াও 'ত্মড়ঙ্গব্ধড়প্প ড্রুপ্সত্তব্দন্দ' থেকেও ওঁর তিনটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে।

ফিরোজ দস্তুর ছাড়াও তৎকালীন আর যে 'কিরানা' ঘরের শিল্পীর নাম করতেই হয়, তিনি হলেন বাসবরাজ রাজগু। এঁরও রেকর্ড পাওয়া মুশকিল, তবে এইচ. এম. ভি. থেকে প্রকাশিত ক্যাসেটে এঁর 'কাফি ', 'সারং' ও 'মালকোঁষ'পাওয়া যায়। 'কিরানা' ঘরানার আরেক বর্তমান প্রজন্মের শিল্পী হলেন প্রভা আত্রে -- যার ঠুংরী গান এই সময়ের শ্রোতাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এখানে কিরানার আরো দুজন শিল্পীর নাম উচ্চারণ না করলে অন্যায় হবে--এক, বসন্তরাও দেশপাণ্ডে এবং দুই, মানিক বার্মা। তবে সবার নাম উল্লেখের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। 'কিরানা' ঘরানার শিল্পীদের লিস্টি দীর্ঘতর করে লাভ নেই, যে দুজনের কথা না বলে উপায় নেই, তাঁদের প্রসঙ্গে পৌঁছেই এই ঘরানার দরজা এবার বন্ধ হবে।

আবদুল ওয়াহিদ খাঁ

'কিরানা' ঘরানার ভিন্ন ধারার প্রতিষ্ঠাতা আবদুল ওয়াহিদ খাঁ। এঁর গায়নশৈলী আবদুল করিমের তুলনায় অনেক অংশেই ভিন্ন ছিলো--যার মধ্যে মীরখণ্ডের প্রভাব একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। ইনি তিন ঘণ্টার কমে আলাপ করতেন না। তা-ও আবার বিলম্বিত লয়ে। অর্থাৎ আবদুল করিমের বিলম্বিতে রাগ বিস্তারের চেয়েও ধীর গতিতে চলত এই ম্যারাধন রাগালাপ। প্রতিটি স্বরের ওপর পড়তো সমান ন্দ্বপ্পন্দ্ধড্ডব্দন্দ. আবদুল ওয়াহিদ খাঁ দ্রুত খেয়াল বা ছোটো খেয়াল গেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। শেষের দিকে তান করতেন, তাও খান দুয়েকের বেশি নয়। এঁর গানে অবশ্য অন্তরা অংশ পাওয়া যায়, যা পাওয়া যায় না ওঁর ভাবশিষ্য আমীর খাঁর গানে। আবদুল ওয়াহিদ খাঁ ঠুংরীগাননি কখনো নিজে, অথচ ওঁর কাছে তালিম পেয়েছিলেন গজল ও ঠুংরীর সম্রাজ্ঞী বেগম আখতার --কিন্তু আখতারী বাইয়ের খেয়াল কেউ কখনো শুনেছে কি? আবদুল ওয়াহিদের 'দরবারী' ও 'মুলতানী'র রেকর্ড পাওয়া যায়।

আমীর খাঁ

আমীর খাঁ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে একজন 'রেভলিউশনারী'--সে অর্থে ওঁকে 'বিপ্লবী' বলা যেতে পারে। Intellectual এবং emotional appear কে যাঁরা অভিন্ন বলে ভাবেন--তাঁদের রক্তে মজ্জায় আমীর খাঁ ঢুকে যাবেই।

'ফর্ম' বা ট্রাডিশনের গণ্ডী টপ্‌কে শিল্পী মানসের ব্যক্তিত্বকে জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা অনেক কঠিন কাজ। এই কাজটিই অনায়াসে করেছিলেন আমীর খাঁ। একজন অখ্যাত সারেঙ্গীবাদক (শাহ্‌মীর খাঁ)-এর সন্তান হয়েও এই উচ্চতায় উঠে আসা এবং ভারতবর্ষের সর্বকালের সেরা পাঁচজন শিল্পীর একজন হওয়া--আমীর খাঁর মতো genius এর পক্ষেই বোধহয় সম্ভব। এঁর প্রকৃত ঘরানা নিয়ে মতভেদ আছে। এর গানে রজব আলি এবং আমন আলির প্রভাব পেয়েঅনেক সমালোচক এঁকে 'ইন্দোর' ঘরানায় অথবা 'ভেণ্ডিবাজার' ঘরানায় ফেলতে চান। তবে আমীর খাঁকে 'কিরানা' ঘরানার একজন শিল্পী হিসেবেই পরিগণিত করা ভালো। ওঁর গায়নশৈলীতে আবদুল ওয়াহিদ খাঁর ধাঁচে সরগম্-এর ব্যবহারই সে কথা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট বলে আমি মনে কবি। তাছাড়া আমীর খাঁর গানে আবদুল করিমের ধ্যানমগ্নতা বা contemplative seriousness এর জাদুস্পর্শও পাওয়া যায়। আমীর খাঁর গায়কীর মস্ত বড়ো প্রভাব পঁড়েছে বিখ্যাত সেতারিয়া পণ্ডিত নিখিল বন্দোপাধ্যায়ের বাজনায়। আমীর খাঁ ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ডকরা 'আভোগী', 'মারওয়া', 'মেঘ', 'ললিত' পরপর পাশাপাশি শুনলে একথা স্পষ্টতাই উপলব্ধি হবে। আমীর কাঁ তাঁর গান থেকে অন্তরা অংশটিকে একেবারে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। তার পেছনেও গল্প আছে-- তবে তা বলার অবকাশ এখানে বিশেষ নেই। ওঁর গানে 'মুড়কি'র প্রয়োগও পাওয়া যায়, তবে সেটা সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়, যেটা হলো ধীর লয়ে (অধিকাংশই 'ঝুমরা' তালে) বিস্তারের পর হঠাৎ এক climatic উত্তরণ। ঝড়ের বেগে নেমে আসতো দ্রুত ঝর্ণাধারা -- উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'মালকোঁষ'-এ বিলম্বিতে 'জিনকে মন রাম বিরাজে'র পর আচম্বিতে শু হয়ে যায় ভয়ানক দ্রুত স্পিডে 'আজ মোরে ঘর আইলা বলমা' । আমীর খাঁর প্রিয় রাগ অবশ্য 'দরবারী', 'মারওয়া' এবং 'মেঘ'। শেযোক্ত রাগে ওঁর গান 'বরখা ঋতু আই' শোনার অভিজ্ঞতা সারাজীনেরঅন্যতম সম্পদ হয়ে থাকর মতো। আমীর খাঁর গানে যে প্রকার মন্দ্র, গম্ভীর গভীরতার আস্বাদ পাওয়া যায়, তা অন্য কারোর গানে এভাবে পাওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি না। ওঁর সম্পর্কে বহু ব্যবহৃত সেই কথাটিই ব্যবহার করতে হয়-- 'বড়ন্দ্ব ত্রব্ধন্তপ্তন্দ্ব নব্দ ব্ধড়ন্দ্ব ত্ত্ব'. যখন শিল্পী খ্যাতির শিখরে অবস্থান করেছেন তখন ৬২ বছর বয়সে ১৯৭৪ সালে শিল্পীর মৃত্যু হলো এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। বোধহয় ভুল বললাম। শিল্পীর মৃত্যু - আদৌ হয় কি ?

যে সমস্ত গানের জন্য আমীর খাঁ চিরকাল বেঁচে থাকবেন আমাদের মনে, তার কয়েকটি--

লালিত দরবারী চাকেশী
মেঘ শুদ্ধ কল্যাণ মিয়াঁ মল্লার
আশাবরী বেহাগ রামদানী মল্লার
মালকোষ হংসধবনী বাগেশ্রী
মারওয়া আভোগী পুরিয়া ধানেশ্রী

আগ্রা ঘরানা

আমাদের আলোচনার দু'নম্বর ঘরানা এই 'আগ্রা' ঘরানা। ভারতের তিনখানি ধ্রুপদ-ভাঙা খেয়াল গানের ঘরানার মধ্যে অন্যতম 'আগ্রা' ঘরানা। অন্য দুটি বলে দিতে হয় না-- 'জয়পুর' ও 'গোয়ালিয়র'। অনেক সমালোচকের মতো খুদাবাখ্‌শ 'গোয়ালিয়র' থেকে 'আগ্রা'য় খেয়াল আমদানী করেন। তবে বয়সের দিক থেকে 'আগ্রা' ঘরানা অত্যন্ত সুপ্রাচীন--এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'সাজন পিয়া' খাদিম হোসেনের ওপর লেখা বইতে জয়বন্ত রাও অবশ্য ভিন্ন মত ব্যত্ত করেছেন। তাঁর মতে, 'আগ্রা' ঘরানার সূত্রপাত করেন নায়ক গোপাল, যাঁকে আমীর খস তর্কে হারিয়ে আলাউদ্দিন খিলজির সময়ে দিল্লীর দরবারে নিয়ে আসেন। তবে বর্তমান 'আগ্রা' খেয়াল গায়কীর সূত্রপাত ঘটে 'ঘগ্‌গে' খুদা বখ্‌শের হাত ধরেই। এই খুদা বখ্‌শ ছিলেন 'আগ্রা'র অবিসংবাদী সম্রাট ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর দাদুর বাবা। এই 'ঘগ্‌গে' খুদাবখ্‌শের পুত্র গোলাপ আববাস খাঁর কাছে শু হয় ফৈয়াজ খাঁর তালিম। ফৈয়াজ খাঁর গায়কী অনুসরণ করেই ধীরে ধীরে আকার পায় 'আগ্রা' ঘরানার স্টাইল। এক ধরণের পুষালি ছব্ধব্দন্তুত্তপ্তন্দ্বগ্ন ঢং পাওয়া যায় এই ঘরানার শিল্পীদের মধ্যে, যা আপাতভাবে রক্ষ হলেও ভীষণ আকর্ষণীয়। যাতে 'লয়কারি', সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ফৈয়াজ খাঁই প্রথম এই ঘরানার খেয়ালে ধ্রুপদের 'নোম্ তোম্' আলাপ নিয়ে আসেন। 'কিরানা'র গায়কীতে যেমন 'অ' --কারের প্রাধান্য বেশি, এই গায়কীতে তেমনি 'অ'কার মাত্রিক শৈলীই প্রাধান্য পায়। ফলতঃ একধরণের জোরালো, কাটা - কাটা, ছন্দে বাঁধা আবর্তিত গান আমরা পাই--যা সহজেই মনকে উত্তেজিত করে--মানসিক ভাবে বাধ্য করে গানের সঙ্গে অংশগ্রহণ করার। এই 'ত্ত্বজব্ধনন্তুনন্দ্রব্ধনঙ্গ'-এর দিকেই ফৈয়াজ খাঁ তাঁর সঙ্গীত জীবনে সবচেয়ে বেশি গুত্ব আরোপ করেছেন। 'আগ্রা' ঘরানায় ধ্রুপদের পাশাপাশি ছোটো খেয়াল, বড়ো খেয়াল, সাদ্‌রা, ঠুংরী তারানা, ইত্যাদিও গাওয়া হয়ে থাকে। এই ঘরের শিল্পীদের গীত রাগের বিভিন্নতার ব্যাপ্তিও সুবিশাল।

এই ধরণের গায়কী মহিলা কন্ঠের তুলনায় পুষ কন্ঠের প্রতি অধিক মানানসই হলেও 'আগ্রা' ঘরানায় কিংবদন্দী মহিলা শিল্পীদের অভাব ঘটেনি কখনো। যেমন, জোহরাবাই আগ্রাওয়ালি, মালকাজান আগ্রাওয়ালি, জানকিবাই, এবং তার পরবর্তী প্রজন্মে দীপালী নাগ ও অন্‌জানিবাই লোলেকার। এ প্রসঙ্গে আমরা এঁদের সম্পর্কে আলোচনায় যাবো না, শুধুমাত্র এঁদের গাওয়া বিখ্যাত কয়েকটি ঠুংরী ও খেয়ালের তালিকা দেওয়া হলো।

জোহ্‌রাবাই আগ্রওয়ালি
সোহিনী খামাজ দাদ্‌রা কেদার
মাজ্ খামাজ গৌড় সারং ইমনকল্যাণ
বসন্ত ঝুলা জৌনপুরী

মাল্‌কাজান আগ্রাওয়ালি
জৌনপুরী সাহানা
গারা সাওন

জানকিবাই

পিলু হেরি কাফি ঠুংরী কাজরী
গারা হোরি গৌড় মল্লার চাঁচোর
মাঞ্জ ঝিবোঁটি মজমুয়া

প্রখাত সঙ্গীত সমালোচক শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, ভারতের দু'জন শিল্পীর কখনো বিরূপ সমালোচনা হয়নি--এমনকী ফৈয়াজ খাঁ বা আবদুল করিম খঁারও বিদ্ধে সমালোচনা হয়েছে। এই দুজন, যাঁরা শুধু প্রশংসাই পেয়েযেন, তাঁরা হলেন--জোহ্‌রাবাই এবং ভাস্করবুয়া। ভাস্করবুয়ার কথা পরে অন্য কোনো জায়গায় বিস্তরিত আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো, কিন্তু ভাস্কর বুয়ার কোনো রেকর্ড নেই, তাই ওঁর নাম স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের। আর জোহ্‌রাবাইয়ের ভক্ত ছিলেন ফৈয়াজ খাঁ স্বয়ং। জোহ্‌রাবাই ছাড়া আর দুজন প্রাক্ ফৈয়াজ খাঁযুগের 'আগ্রা'র গাইয়ের নাম করতে হয়, তাঁরা হলেন--মৌজুদ্দিন খাঁ (যঁার ভৈরবী ঠুংরী 'বাজুবন্দ খুল খুল যায়ে' 'ফৈয়াজ খাঁ গেয়েছেন কিঞ্চিৎ অন্য পথে হেঁটে), আর নথ্থন্ খাঁ। এই মৌজুদ্দিন খাঁর সঙ্গে কোলকাতায় 'লগন' হয়মালকাজান আগ্রাওয়ালির। এই মালকাজানকে মালকাজান চুলবুল্লেওয়ালির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই। মালকাজান আগ্রাওয়ালিকে এখনো অনেক সঙ্গীতবোদ্ধা এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ বলে মনে করেন। এপ্রসঙ্গে বাংলার 'গহরজান'--এর নাম উল্লেখ না করে উপায় নেই। গহরজান যে কতো বড়ো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন, তার প্রমান মিলবে ওঁর রেকর্ড করা নিম্নলিখিত গানগুলি শুনলে--

পিলু হোরি গারা হোরি ভৈরবী ঠুংরী জৌনপুরী
যোগিয়া ঠুংরী দেশ্ মাণ্ড্ তিলককামোদ।

গহরজানের ছাত্রী ইন্দুবালা দাসীও সমধিক বড়ো মাপের শিল্পী ছিলেন, যদিও দুঃখের বিষয়, এঁকে এখনো অধিকাংশ লোকে চেনেন বাংলা রাগপ্রধান গায়িকা হিসাবে। কিন্তু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ইন্দুবালার দখলের সাক্ষী হয়ে আছে ওঁর 'গারা' ঠুংরী এবং ভৈরবী ঠুংরী গানের রেকর্ড তুলনামূলকভাবে আধুনিক প্রজন্মের শিল্পী অনজানিবাই লোলেকারও অসম্ভর প্রতিভাবান, বিশেষ করে ওঁর নট্‌বেহাগে রেকর্ড করা 'ঝন ঝন ঝন পায়েল বাজে' এক অবিস্মরণীয় কীর্তি হয়ে আছে। অনজানিবাই-এর গাওয়া অন্যান্য রাগগুলি হলো---

জয়জয়ন্তী বাগেশ্রী শংকরা
আড়ানা গৌড় মল্লার বেহাগ

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বর্তমান 'আগ্রা' গায়কীর সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক হলেন ফৈয়াজ খাঁ। এঁর পরেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলনে ওস্তাদ বিলায়েৎ হুসেন খাঁ। এছাড়াও আছেন খাদিম হুসেন খাঁ লতাফৎ হুসেন খাঁ, শরাফৎ হুসেন খাঁ, আতা হুসেন খাঁ, আজমৎ হুসেন খাঁ, ইউনিস হুসেন খাঁ, শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরজী প্রমুখেরা। আমরা এঁদের সম্পর্কে এবার সংক্ষেপে আলোচনা করবো--অর্থাৎ এঁদের পরিচয় ও রেকর্ড করা রাগের নামের তালিকা পেশ করবো।

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ

ভাস্কর বুয়া বাখ্‌লের পরে চৌমুখা গানে দ্বিতীয় কোনো গায়ক হিসাবে ফৈয়াজ খাঁ ছাড়া অন্য কারো নাম নেওয়া অসম্ভব। ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ ছিলো শাহী, দরবারী--ভীষণ গ্রাম্ভারী রসিক কোনো কবির কণ্ঠ। এমন কণ্ঠকে আমীর খাঁ 'ম্যাজেস্টিক্' বলে বর্ণনা করতেন। ফৈয়াজ খাঁ জন্মানোর আগেই ওঁর বাবা 'রঙ্গিলা' ঘরানার শিল্প সফদর খাঁর মৃত্যুহয়। ফৈয়াজ খাঁকে শৈশব কাল থেকে তালিম দিতে শু করেন ওঁর দাদু খুদা বখ্‌শ্। ধ্রুপদ - ধামারের পাশাপাশি খেয়ালের তালিম পান চাচা কল্লন খাঁর কাছ থেকে। বরোদার সয়াজীরাও গায়কোয়াড়ের দরবারে সভাগায়ক হিসাবেবহুকাল নিযুক্ত ছিলেন ফৈয়াজ খাঁ। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখার ফৈয়াজ খাঁর অসাধরণ 'স্থাপত্য-শিল্পগুণ'-এর প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে আলাপের সময়ে এই শিল্পসুষমা প্রকাশিত হতো আরো বেশি করে। মনে হতো যেন ধীরে ধীরে চোখের সামনে গড়ে তোলা হচ্ছে লাল পাথরের কোনো মজবুত কেল্লা। আমরা অবশ্য ফৈয়াজ খাঁর যা গান শুনেছি রেকর্ড ও ক্যাসেটের দৌলতে--তার সবই প্রি-ইলেকট্রনিক যুগের রেকডিং --যেখানে মাইক্রোফোনের থেকে হাত তিনেক দুরে শিল্পীকে বসাতে হোত। মাইক্রোফোনের সামনে বসালে ওঁর গলার জোয়ারি তথা গাম্ভির্যের জন্য distorted আওয়াজ আসতো। তাছাড়া ওঁর কয়েকটি রেকডি ং, যা গ্রামফোন কোম্পানির দৌলতে পাওয়া যায়-- তা এমন সময়ে রেকর্ড করা, যখন খাঁ সাহেবের একেবারে শেষ অবস্থা --টি.বি.তে দুটো ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ফুসফুসে নিয়ে ফৈয়াজ খাঁর রেকর্ড করা ভগ্নস্বাস্থ্যের গান--তা শুনে ওঁর প্রকৃত কণ্ঠের কতোটুকুই বা আন্দাজ করা যায় ? তা-ও যেটুকু শোনার সৌভাগ্য আছে --তাতে খাঁ সাহেবের বাজখাঁই গলায় ললিতের 'তরপর হুঁ য্যায়সে', রামকেলীতে 'উনসঙ্গ লাগি আখিয়া', নটবেহোগের দ্রুত খেয়াল 'ঝনঝন ঝনঝন পায়েল বাজে', পরজে 'মনমোহন ব্রিজ কো রসিয়া' কোনোদিন ভোলার নয়। অত ভারী গলার হলক্ তান--অথচ কী মিষ্টত্ব, কী অপূর্ব - সৌন্দর্য চেতনা!

'ডংকর' ও 'দেশি'তে ওঁর ধ্রুপদ-ধামার শুনলে প্রকৃত গান কীরকম হওয়া উচিত -- যাকে বলে 'অস্‌লি রীত কা গানা' তার পরিচয় পাওয়া যাবে ; বিশেষ করে ধ্রুপদে ওঁর 'নোম্ তোম্' আলাপ -- যা যতোবার শুনি-- ততোবারই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। খাঁ সাহেবের শুনেছি আর একটা বড়ো গুণ ছিলো -- তা হোল, সমস্ত রকম শ্রোতার সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নেওয়া যা অনেক বড়ো শিল্পীরই থাকে না। শ্রোতাকে কি করে মোহিত করে রাখতে হয়--তা উনিজানতেন, আর তাই 'কাফি', 'তোড়ি', 'জয়জয়ন্তী', 'জৌনপুরী' (''ফুল বনকে গেন্দন'')র মতো বহুল জনপ্রিয় রাগই গেয়েছেন একাধিকবার --শ্রোতার মন রাখতে গিয়ে কখনো বিরত্ত হননি। দর্শকের অনুরোধে সানন্দে পরিবেশন করেছেন ঠুংরী, দাদরা, গজল। ঠুংরী গানও যে কতো উচ্চমানের শিল্প হতে পারে, তার প্রমাণ ফৈয়াজ খাঁই প্রথম করেন--তথাকথিত, প্রচলিত রীতি ও চালকে ভেঙে দিয়ে। ওঁর গলায় তিলককামোদে 'পরদেশ না যাইয়া', ভৈরবীতে'বাজু বন্দ খুল খুল যায়ে' বা দাদরা 'চলো কাহে কো ঝুটি' বা কাফিতে বাঁধা 'বন্দে নন্দকুমার'-এর কি কোনো তুলনা হয় ? খাঁ সাহেব নিজে মনে করতেন একাধিকবার 'ইশ্‌ক্' না করলে হয়তো ধ্রুপদ - ধামার - খেয়াল গাওয়া যায়, কিন্তু ঠুংরী - দাদরা - গজল গাওয়া যায় না। ওঁর ঠুংরীতে তো বটেই, এমনকী খেয়ালেও টপ্পার দানার ভারী সুন্দর প্রয়োগ পাওয়া যায়--যা অন্য কোনো শিল্পী ইতোপূর্বে ব্যবহার করেননি। ভল্যুম বাড়িয়ে কমিয়ে ইচ্ছে মতো effect তৈরি করতে, 'ফুট', 'পুকার' প্রভৃতির মাধ্যমে একপ্রকার বাতাবরণ বা 'মাহোল' সৃষ্টি করতে--ফৈয়াজ খাঁর জুড়ি

মেলা ভার। এ ব্যাপারে এঁকে কাওয়ালির ঢঙে কিছু কাজও আয়ত্ব করতে হয়েছে। ফৈয়াজ খাঁ যে অনেক বছর আগে জোড়াসাঁকোয় কবিগুকে গান শুনিয়ে গিয়েছিলেন--এ তথ্য আমরা আগে জানা ছিলো না। সম্প্রতি এ খবর পেলাম গজানন রাও যোশী রচিত 'ডড়ষ্গভ্রু ত্তন্দ্বপ্লঙ্গজন্ত ক্ষ্রুন্দ্ব' বইটি পড়ে। ফৈয়াজ খাঁর শিষ্য - শিষ্যারা সংখ্যায় খুব বেশি নন। প্রথম দিকে ওঁর কাছে তালিম পেয়েছেন--দিলীপচন্দ্র বেদী, শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর, সোহান সিং প্রমুখেরা।কয়েকজন প্রখ্যাত বাঙালী সঙ্গীত ব্যত্তিত্বও খাঁ সাহেবের সান্নিধ্যে এসেছিলেন অল্প কয়েকদিনের জন্যে, তাঁরা হলেন--জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়* এবং দীপালি নাগ আরো কয়েকজন। ফৈয়াজ খাঁর কয়েকটি অমূল্য খেয়াল ও ঠুংরীর তালিকায় এবারে আসা যাক,--

ললিত দেশি ধামার পুরিয়া দরবারী
তোড়ি গৌড় মল্লার তিলক কামোদ পরজ
জৌনপুরী পূবর্বী জয়জয়ন্তী ডংকর
নট্‌বেহাগ ভৈরবী দাদরা ও ঠুংরী সুগ্‌রাই দেশ
বারওয়া ছায়া কাফি রামকেলি

বিলায়েত হুসেন খাঁ

বিলায়েত হুসেন খাঁর মতো শিক্ষিত, পণ্ডিত এবং চিবান ব্যক্তিত্ব আগ্রা ঘরানায় খুব কমই এসেছে। ইনি***

*এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী এবং চিন্ময় লাহিড়ী অল্প বিস্তর ঘরানার তালিম পেলেও এঁদের সঠিক ঘরানায় সীমাবদ্ধ করে রাখাটা পুরোপুরি যুক্তসঙ্গত নয়। এই তিন বাঙালী সঙ্গীত দিকপালকে নিয়ে পরবর্তীকালে লেখার ইচ্ছে রইলো। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীকে অবশ্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'বিষ্ণুপুর' ঘরানার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এঁদের সম্পর্কেও আলোচনা করা সম্ভব হলো না। ইচ্ছে সত্ত্বেও এ অ ালোচনা মুলতুবি করতে হলো বলে পাঠক মার্জনা করবেন।

*** প্রকৃত অর্থেই শিক্ষকের জীবনযাপন করেছেন। এঁকে একাধারে ফৈয়াজ খাঁর খলিফা এবং শিষ্য বলা যায়, কারণ ইনি ফৈয়াজ খাঁর ন্যায় তালিম পেয়েছিলেন কল্লন খাঁর কাছে, --আবার পরবর্তীকালে ফৈয়াজ খাঁর কাছেও তালিম নেন। এঁদের মধ্যে আত্মীয়তারও সম্পর্ক ছিলো। বিলায়েত হুসেন তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেন ফৈয়াজ খাঁর দুই ভাগ্নে লতাফৎ হুসেন ও শরাফল হুসেনের সঙ্গে। সব মিলিয়ে সারা জীবনে উনি একচল্লিশ জন গুর কাছে তালিম নিয়েছিলেন--যার প্রশংসা করেছেন স্বয়ং ফৈয়াজ খাঁ। ইনি নথ্থন খাঁর পুত্র কিন্তু পিতাকে অকালেই হারান। 'আগ্রা'ঘরানার বিশেষ পুষালি গায়নশৈলী, লয়কারী, নোম্‌-তোম্‌-আলাপ, বে ালতান, 'বোলবানও', 'বোল বাঁট'--এই সবকটি বৈশিষ্ট্যই পুরোমাত্রায় পাওয়া যায় বিলায়েত হুসেনের কণ্ঠে। উনি বাল্যকালে মহম্মদ বখ্‌শের কাছে মানুষ হন এবং ওঁর সঙ্গীতের হাতেখড়িও সেখানেই। বিলায়েত হুসেন 'প্রাণ পিয়া' ছদ্মনামে বহু বন্দিশ রচনা করে গেছেন।ওঁর গাওয়া বিখ্যাত খেয়ালগুলি নিম্নলিখিত রাগে আধা রিত--

আশাবরী দেশকর খম্বাবতী ধ্যানশ্রী
বিলাবল বৃন্দাবনী সারং বাহার ছায়ানট
রামকেলি বারওয়া সোহিনী সোহিনী পঞ্চম, ইত্যাদি।

খাদিম হোসেন খাঁ

এঁর 'তখল্‌লুস' বা ছদ্মনাম ছিলো 'সজন পিয়া'। এই নামে ইনি অনেক বন্দিশ রচনা করে গেছেন। ইনি আলতাফ্‌ হোসেনের পুত্র এবং ফৈয়াজ খাঁর ভাগ্নে। খাদিম হোসেন 'আগ্রা' ঘরানার বর্ষীয়ান শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম--এঁর গোটা জীবনই কেটে গেছে ঘরের অন্যান্য ছেলে-পুলেকে তালিম দিতে দিতে। ফৈয়াজ খাঁর পেছনে বসে এঁকে গাইতেও হয়েছে এবং সে কাজটি উনি যথাযথই করেছেন, ফলতঃ মামার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হননি কখনো। এঁর সঙ্গীত জ্ঞানের ওপর ফৈয়াজ খঁ ার যথেষ্ট ভরসাও ছিলো--তাই কোনো জলসায় গেয়ে আসার পর ফৈয়াজ খাঁর গু তথা দাদু গোলাম আববাস খাঁ নিয়মিত খোঁজ নিতেন এই খাদিম হোসেনের ক াছেই - ফৈয়াজ ঠিকঠাক গাইলেন কিনা। তবে খাদম হোসেন নিজে কখনোই ভীষণ ম্যাহফিলবাজ ছিলেন না, এবং এঁর জীবন ভীষণ সংযমী মৌলানার মতোই ছিলে া। এঁর বেশি রেকর্ড পাওয়া যায় না। তাও ওঁর গাওয়া যে দুটি রাগ উপলব্ধ--তা হলো--বেহাগ এবং গৌড় মল্লার।

লতাফৎ হোসেন এবং শরাফৎ হোসেন খাঁ

লতাফৎ হোসেন হলেন খাদিম হোসেনের আপন ভাই, অর্থাৎ ফৈয়াজ মামু'র তালিম ও দাক্ষিণ্য পর্যান্ত পরিমাণেই পেয়েছিলেন। খাদিম ও লতাফতের আর এক ভ াই আনওয়ার হোসেনও বেশ প্রতিভাশালী গাইয়ে ছিলেন -- কিন্তু বেশিদিন ইহলোকে না থাকতে পারায় লোকে ওঁকে সহজেই ভুলে গেছে। এই আনওয়ার হে াসেনের এক জতলসায় গান শুনে জয়পুরের কিশোরী আমুনকর তৎক্ষণাৎ নজরানা দিয়ে আনওয়ার হোসেনের গাণ্ডাবন্‌ধ্‌ শিষ্যা হয়ে যান। যাই হোক, লতাফৎ হে াসেনের প্রাথমিক শিক্ষা বাবা আলতাফ্‌ হোসেনের কাছে হলেও ইনি ফৈয়াজ খাঁর তত্ত্বাবধানেই গান শিখতে শু করেন এবং ইনিই সবচেয়ে ভালোভাবে ফৈয়াজ গ ায়কী গাইতে পারতেন--সেই একই বোলবাট্‌ ও গাম্ভীর্য্য হল তান সহ। লতাফতের গাওয়া যে কটি খেয়াল পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য --পট্‌দীপ, বাগেশ্রী-ব াহার, সুহা, বারওয়া, যোগ, মেঘমল্লার।

শরাফৎ হোসেনের কথায় আসি । ইনি লয়কারী তথা তানের স্পিডে ওঁর সময়ের যে কোনো শিল্পীকে টেক্কা দিতে পারতেন। খুব ছেলেবেলা থেকেই ইনি গান গ াইতে শু করেন এবং খুব অল্পবয়সেই যে শরাফতের ঋদ্ধন্তত্ত্ব উন্মোচিত হতে শু করে--এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। এঁর শিক্ষা মূলতঃ ফৈয়াজ খাঁর কাছেই, তবে খাদিম হোসেন, বিলায়েত হোসেন ও আতা হোসেনের কাছেও শরাফৎ তালিম পান। শরাফৎ হোসেন ছিলেন লিয়াকৎ হুসেনের সুপুত্র, অর্থাৎ হোসেন ও লতাফৎ হে াসেনের খুড়তুতো ভাই। শরাফত হোসেনের রেকর্ড আছে--'হুসেনী কানাড়া'র।

আতা হোসেন এবং বন্দে হাসান

আতা হোসেন সম্পর্কে ফৈয়াজ খাঁর শ্যালক ছিলেন এবং সেই সূত্রে ইনি বহুদিন বড় খাঁ সাহেবের তালিম পেয়েছিলেন। ইনিই ছিলেন ফৈয়াজ খাঁর স্নেহধন্য সিনিয়র মোস্ট শিষ্য। আতা হোসেনের ভাই বন্দে হাসানও তৎকালীন বেশ নামকরা গাইয়ে ছিলেন। বন্দে হাসান ও আতা হোসেন ছিলেন মেহবুব খাঁর দুই ছেলে। এই মেহবুব খাঁ 'দরস পিয়া' ছদ্মনামে কয়েকটি জনপ্রিয় বন্দেশ রচনা করেছিলেন। বন্দে হাসানের গাওয়া 'ভাটিয়ার' ও 'দূর্গা' রাগের খেয়াল আগ্রা এবং অ াত্রৌলি গায়কীর মেলবন্ধনের ছাপ বহন করে।

এই পরিবারে আরো দুজন শিল্পীর নাম করতে হয়--ইউনুস হুসেন খাঁ এবং আজমত হোসেন খাঁ। প্রথম জন বিলায়েত হুসেন খাঁর যোগ্যপুত্র, ফৈয়াজ খাঁর স্নেধন্য

(এঁর গাওয়া 'সাহানা' রাগের রেকর্ড শুনে নেওয়া উচিত), এবং দ্বিতীয়জন হলেন বিলায়েত হুসেনের শ্যালক অর্থাৎ ইউনুসের মামা। আজমত হোসেনের গাওয়া এই রাগগুলি এইচ.এম.ভি-র ক্যাসেটে উপলব্ধ--

তোড়ি ধ্যানশ্রী

মারওয়া ইমন

পূর্বী ঠুংরী ("পনঘটওয়া পে নন্দলাল")।

শ্রীকৃষ্ণ রতন্‌জনকর

'আগ্রা' ঘরানার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি রতনজনকরজীর কথা উল্লেখ না করা হয়। এঁর জীবনের মতো গানও ভীষণ আকর্ষণীয় রকমের ছিলো। ফৈয়াজ খাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র রতনজনকর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ওঁর একান্ত নিজস্ব 'ন্দ্ধন্দ্বপ্তপ্তন্দ্বস্তব্ধস্ত্রপ্তর্দ্নান্ধক্তস্বস্তড়' এর জন্যে। শোনা যায়, ওঁর কৈশোরের গান শুনে আবদুল করিম খাঁ খুশি হয়ে গান শেখাতে চেয়েছিলেন, তবে ততোদিন তিনি পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শিষ্য। অবশ্য ভাতখণ্ডের কাছে যাওয়ার আগে উনি নানা শিল্পীর কাছে নানা গাওকীর তালিম পান।মাত্র সাত বছর বয়সে উনি দীক্ষিত হন 'পাতিয়ালা' ঘরানার শিক্ষায়, তারপর উনি বেশ কিছুদিন তালিম পান গজানন রাও যোশীর পিতা অনন্ত মনোহর যোশী বা অন্তবুয়ার কাছে। অন্তবুয়া 'গোয়ালিয়র' গাইতেন--আর তাই রতনজনকর গোয়ালিয়র ঘরানার সঙ্গীতও যথেষ্ট পরিমাণে শেখেন, যা পরবর্তী জীবনে মুশ্‌তাকে হোসেনের গায়কী, বিশেষ করে ওঁর তানবাজি ওঁর সঙ্গীতজীবনে প্রভাব ফেলতে সাহায্য করে। শেষ কালে রতনজনকর 'আগ্রা'র ফৈয়াজ খাঁরকাছে গাণ্ডা বাঁধেন এবং ওঁকে শেষ অবধি 'আগ্রা'রই কেজন অবিস্মরণীয় শিল্পী হিসেবে মনে রাখা উচিত। অবশ্য রতনজনকরের গানে আগ্রা ও গোয়ালিয়র গায়কীর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিলো--যা আমরা পরবর্তীকালে পেয়েছি ওঁরই ছাত্র দিনকর কৈকিনীর কণ্ঠে। এরকম উদাহরণ আরো আছে, যেমন যৌবনে চিন্ময় লাহিড়ী (যিনি ধ্রুবতারা যোশীর কাছে অনেক বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন) এবং অবশ্যই কে.জি. গিণ্ডে। এই শেষোক্তজন তাঁর ধ্রুপদ-ধামারের জন্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণরতনজনকর সম্বন্ধে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব স্বয়ং যে মন্তব্য করেছিলেন, তা এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"দেকো, শ্রীকৃষ্ণ কোই মামুলি আদ্‌মী নহী হৈ। য়হ্‌ ঠিক হৈ কি বহ্‌ মেরা শাগিরদ্‌ হৈ মগর উস্‌কে জৈসা গাওয়াইয়া হিন্দুস্থানমে নিকট্‌ ভবিষ্যমে নহী মিলেগা। উসকী মৈ বড়ী ইজ্জত করতা হুঁ" --ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ।

শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের কয়েকটি মাত্র খেয়াল ক্যাসেটে পাওয়া যায়। সেগুলি হলো ইমনী বিলাবল বসন্ত্‌ মুখরী মিয়াঁ কি সারং কেদার বাহার এবং রামদাসী মল্লার।

শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের অন্য একটি কারণে চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবেন। তা হলো--পণ্ডিত ভাতখণ্ডের ভাবশিষ্য হিসাবে ইনিই সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে ভাতখণ্ডের Theoryও সূক্ষ্ম রাগতত্বের ঠাটভিত্তিক প্রচার করেছিলেন, যার দায়িত্ব পরবর্তীকালে শিল্পী মালবিকা কাননের বাবা শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের ওপরও বর্তায়।

'গোয়ালিয়র ঘরানা'

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতম ঘরানা হিসাবে 'গোয়ালিয়র' গায়কীকেই চিহ্নিত করা হয়। এই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সাধারণত হদ্দু খাঁ হস্‌সু খাঁর নাম করা হয়, কিন্তু এই ঘরানার প্রকৃত সূত্রপাত হয় মখ্‌খন খাঁর মারফৎ--যিনি ছিলেন 'কাওয়াল বচ্চে' ঘরানার গুলাম রসুলের শিষ্য ওবং গুলাম রসুলের জামাই শক্কর খাঁর ভাই। এই গোলাম রসুলই ভারতে প্রথম ধ্রুপদ ভেঙে খেয়ালের প্রবর্তন করেন এবং সেই মতো তালিম দেন ছেলে গুলাম নবীকে, জামাই শক্কর খাঁ ও তাঁর ভাই মখ্‌খন খাঁকে। এদের গুলাম নবী 'শোরী মিক্কা' নামে পরবর্তীকালে বিখ্যাত হন এবং ইনিই টপ্পা গানের জনক। মখ্‌খন খাঁ তাঁর পুত্র নথ্‌থন পীর বখ্‌শকে যে খেয়ালে তালিম দেন--তাই বর্তমান 'গোয়ালিয়র' গায়িকী। এই নর্থথন পীর বখ্‌শ-এর কাছেই তালিম নেন 'আগ্রা'র ঘগ্‌গে খুদাবখ্‌শ্‌ এবং আবদুল্লা খাঁ--এইভাবেই গোয়ালিয়র থেকে আগ্রায় খেয়াল রপ্তানী হয়। উপরিউক্ত নথ্‌থন খাঁর দুই শিষ্যর মধ্যে প্রথম জন ছিলেনফৈয়াজ খাঁর দাদুর বাবা (তা আগেই উল্লেখ করেছি) এবং দ্বিতীয়জন হলেন সেই আবদুল্লা খাঁ, যাঁকে ফৈয়াজ খাঁ আজীবন নিজের 'হিরো' বলে মেনে এসেছেন। এই দুই জন ছাড়াও নথ্‌থন পীর বখ্‌শ তালিম দিয়েছিলেন পুত্র কাদির বখ্‌শ্‌কে এবং এই কাদির বখ্‌শের উত্তরাধিকার সূত্রেই গোয়ালিয়রের তালিম পান তাঁর তিন পুত্র হদ্দু হস্‌সু এবং নথ্‌থু খাঁ। অবশ্য এই তিনজনকে তালিম দেওয়ার ব্যাপারে ওঁদের ঠাকুরদা নথ্‌থন পীর বখ্‌শের নামই পাওয়া যায়। সুতরাং এভাবে, 'গোয়ালিয়র' গায়কীর সূত্রপাত হয় মখ্‌খন খাঁ ও তঁার পুত্র নথ্‌থন পীর বখ্‌শের হাত ধরে এবং হদ্দু খাঁ, হস্‌সু খাঁ এবং নথ্‌থু খাঁর দৌলতে। এই তিন ভাইয়ের পরিবার থেকেই বেরিয়ে আসে গোয়ালিয়র ঘরানার তিনটি প্রধান বংশধরের দল। প্রথম দলে ছিলেন হদ্দু খাঁর পুত্র রহমত খাঁ (গোয়ালিয়রের সবচেয়ে বড়ো শিল্পী(,জামাই ইনায়াৎ হুসেন খাঁ এবং সেই সূত্রে মুস্তাক হুসেন খাঁ। দ্বিতীয় দলে, অর্থাৎ হস্‌সু খাঁর সূত্র ধরে এসে পড়ে বালকৃষ্ণ ইচল করঞ্জীকরের নাম--যাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন, অনন্তবুয়া, মিরাশী বুয়া এবং বিষ্ণু দিগম্বর। এঁদের পরবর্তী প্রজন্মে ছিলেন গজানন রাও যোশী, ডি.ভি. পালুস্কর, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, বিনায়ক রাও পটবর্ধন, নারায়ণ রাওব্যাস, বি.আর.দেওধর এবং কুমার গন্ধর্ব। তৃতীয় ভাই, অর্থাৎ নথ্‌থু খাঁর বংশের লোকদের মধ্যে বিখ্যাত হন, ওঁর দত্তকপুত্র নিসার হুসেন খাঁ, শিষ্য রামকৃষ্ণবুয়া, শঙ্কর পণ্ডিত। তারও পরবর্তী প্রজন্মে কৃষ্ণরাও পণ্ডিতকে পাই যিনি 'গোয়ালিয়র' ঘরানার বর্তমান ধারার গায়কীর সবয়েচে বড়ো trend setter হিসাবে স্বীকৃত। যাই হোক, গোয়ালিয়র পণ্ডিতদের ঠিকুজি-কুলজী নিয়ে পরেও আলোচনা করা যেতে পারে। এখন দেখা যাক, গোয়ালিয়র গায়কীর কিছু বিশেষ দিক ও তাদের পরিবেশ পদ্ধতির রকমফের কতোভাবে হতে পারে। এই ঘরে বড়ো খেয়াল ও ছোটোখেয়ালের পাশাপাশি ঠুংরী, টপ্পা, তারানা, সাদরা, ভজন ইত্যাদিও গাওয়া হয়ে থাকে। ধ্রুপদ একমাত্র গান, যা এই ঘরের শিল্পীরা পরিবেশন করেন না, অথচ তাঁদের প্রায় সবারই অসংখ্য খেয়ালের বন্দিশ মুখস্থ। সাধারণত এই ঘরে পরিচিত বা 'আম' রাগই গাওয়া হয়--বিশেষ করে সেই সমস্ত রাগ যেগুলির একটি সাধারণ আবর্তন ও জনপ্রিয়তা আছে, অর্থাৎ মোটেই দুষ্প্রাপ্য নয়--এমন রাগ। গোয়ালিয়রের কোনো কোনো শিল্পীকে শিল্পীকে যে দুষ্প্রাপ্য রাগ গাইতে শোনা যায়নি এমন নয় তবে সেক্ষেত্রে শিল্পী সেই রাগকে কোনো - না- কোনো পরিচিত রাগের প্রকার--এভাবে বর্ণনা করেছেন। এর থেকে এই ঘরানার সহজীকরণ তথা নমনীয় প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

গোয়ালিয়র গায়কীতে আ-কার মাত্রিক আলাপ করাটাই রীতি এবং এই গায়কী যে রক্ষণশীল খেয়াল গানের রীতিকেই অনুসরণ করবে--এটাই স্বাভাবিক। বিলম্বিত খেয়ালের বন্দিশ--এই গায়কীর প্রাণস্বরূপ। ধীরে সুস্থে আকারে স্থায়ী ভরার পর বহ্‌লাওয়া, বোলতান--এর পথ ধরে তানে পৌঁছনো এবং নিয়মমাফিক মীড়, ছুট, গমক, লহ্‌ক আর খটকার প্রয়োগ--গোয়ালিয়র গায়কীকেই চিনিয়ে দেয়। 'গোয়ালিয়র' গায়কদের ফেভারিট তাল হলো তিলওয়াড়া, আড়া চৌতাল এবং ঝুমরা। এই গায়কী কোনোদিনই অতি-বিলম্বিত লয়ের দিকে ঝোঁকেনি--যার প্রবণতা পরবর্তীকালের অধিকাংশ ঘরানার স্টাইলে আমরা পেয়েছি।

রহমত খাঁ

রহমত খাঁ সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। হদ্দু খাঁর বড় ছেলে রহমত খাঁর কথা শোনানোর জন্য অমিয় সান্যালের 'স্মৃতির অতলে' বইয়ের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। তবে এঁর কথায় আসার আগে হদ্দু খাঁর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য বিষ্ণুপন্থ ছাত্রের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, কারণ এঁর কাছেই রহমত খাঁ থাকতেন এবং এঁর সার্কাস পার্টির বিরতির সময়েই নিয়মিত আফিমের গুলির বিনিময়ে রহমত খাঁ গান করতেন। ইনি যে অসম্ভব আফিমখোর এবং কিঞ্চিৎ আধপাগলাটেও ছিলেন--তা জানতে পারি অমিয়বাবুর বই পড়েই রহমত খাঁ যৌবন বয়সে মৌজুদ্দিন খাঁর গান শুনে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে গান গাওয়া ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু মৌজুদ্দিন স্বয়ং হাতে-পায়ে ধরে রহমত খাঁর এহেন ছেলেমানুষী থেকে খাঁ সাহেবকে বিরত করেন। গোয়ালিয়রের সবচেয়ে বড়ো এই খেয়ালিয়ার প্রভাব এড়াতে পারননি জয়পুরে মন্‌জি খাঁ, এমনকী আবদুল করিম খাঁ পর্যন্ত। রহমত খাঁ ও আবদুল করিমের 'যমুনা কি তীর' পরপর শুনলেই এ কথা বোঝা যাবে। রহমত খাঁর গানের যথেষ্ট ছাপ পড়েছিলো হিন্দুস্থানের সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো গাওয়াইয়া ভাস্কর বুয়া বাখ্‌লের গানেও। আমাদের প্রজন্মের দুর্ভাগ্য, এঁর গান রেকর্ডে বা ক্যাসেটে সেরকমভাবে শুনতে পাওয়ার সুযোগ আমাদের হয় নি। তবু যে দুটি রাগ শুনে রহমত খাঁর গানের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো সম্ভব--তা হলো, ইমন ও মালকোঁষ। ইমনে ওঁর 'ধন্‌ ধনাইয়া ধন্‌ ধন তেরো'তে পারিজাতের কল্যাণ বরাটি রাগের ছোঁওয়া লক্ষনীয়। যাঁরা মালকোঁষ বলতে বোঝেন আমীর খাঁ অথবা বড়ে গোলাম--তাঁদের স্বাদ বললের জন্য রহমত খাঁর মালকোঁষ 'পীর ন জানি' কে প্রেসক্রাইব্‌ করা যেতেই পারে।

ওঙ্কারনাথ ঠাকুর

বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্কর (ডি. ভি. পালুস্করের বাবা) -এর কাছে ওঙ্কারনাথ ঠাকুর 'গোয়ালিয়র'-এর তালিম পান। প্রথম দিকে বিষ্ণু দিগম্বরের শেখানো তান ও পাল্টাই 'তৈয়ারি'র সঙ্গে গাইতেন। কিন্তু ক্রমশ ওঁর গানে নানা অতিনাটকীয়তা ঢুকে পড়লো। উনি প্রথম জীবনে নাটকে কাজ করতেন বলে ড্রামাটিক সেন্সটা ছিলো, কিন্তু ভক্তবৃন্দের খ্যাতির বিড়ম্বনায় ওঙ্কারনাথ নিজের গানে দেবত্ব আরোপ করতে চাইলেন--ফলতঃ ওঁর গান নিদাণ মেলোড্রামাটিক আধ্যাত্মিক আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো। উনি ভজন গান গাইতেন খুব ভালোবেসে--ফলে, ওঁর জনপ্রিয়তায় কখনো বাধা পড়েনি। তবে যেভাবে হিন্দুত্বের ধবজা উড়িয়ে ওঙ্কারনাথ সারাজীবন কোনো মুসলমানের তালিম নেননি বলে অহংকার করতেন, তা কট্টরপন্থী সাম্প্রদায়িক লোকজনের ভালো লাগলেও, এ হেন গোঁড়ামি খুব একটা উদারমনস্কতার পরিচায়ক নয়। ওঁর সম্পর্কে, কোনো বিখ্যাত শিল্পীকে পেলেই তাঁর সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ে উপনীত হওয়ার যে সমস্ত গল্প প্রচলিত আছে-- তার দিকে বেশি যাওয়ার জায়গা এটা নয়। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেইযে ওঙ্কারনাথের গলায় জাদু, ওঁর 'রেঞ্জ', 'ভল্যুম্‌' এ সবই সমসাময়িক যে কোনো শিল্পীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে া।আর একটা জিনিস, যা ওঁর গায়কীতে বিশেষ করে পাওয়া যেত--তা হলো 'দ্বন্তড়ঙ্গ' যা অন্য কোনো শিল্পীর গলায়
বড়ো একটা শুনেছি বলে মনে হয় না। আবার ওঙ্কারনাথের 'দেশি' বা 'নীলাম্বরী' শুনলে আমর ভীষণ যুম পেয়ে যায় (এটা হয়তো আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রহণক্ষমতার অক্ষমতাই)। তবে ইতালিতে স্বয়ং মুসোলিনি সাহেবও যে ওঙ্কারনাথের গান শুনে ঘুমে ঢলে পড়েছিলেন--তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ওঙ্কারনাথের শিল্পী জীবনে এমন একটি অধ্যায় ছিলো যে সময়ে ওঁকে ছাড়া কোনো সঙ্গীত কনফারেন্স্‌ বা সেমিনার ডাকার কথা ভাবা যেত না। সব জায়গাতেই উনি মধ্যমণি হয়ে বসতেন, 'নাদ', 'ব্রহ্ম' সম্পর্কিত ওঁর কিছু ফেভারিট theory কপচাতেন এবং সরাসরি পণ্ডিতভাতখণ্ডের মতাদর্শের বিরোধিতা করতেন বেশ উচ্চঃস্বরেই। তিন দশক ধরে একাদিক্রমে রাজত্ব করার পর ওঙ্কারনাথের জীবনাবসান হয় ১৯৬৭ সালে। ওঁর কয়েকটি জনপ্রিয় খেয়ালের তালিকা নীচে দেওয়া হলো, (সেই সঙ্গে একটি ঠুংরীও)--
তোড়ি সুখ্‌রাই চম্পক্‌
দেশি তোড়ি তানকেশ্রী শুদ্ধ কল্যাণ
দেশ্‌কর নীলাম্বরী শুদ্ধ নট্‌ এবং তিলং ঠুংরী

ডি. ভি. পালুস্কর

পুরো নাম দত্তাত্রেয় বিষ্ণু পালুস্কর। পিতা পণ্ডিত দিগম্বর পালুস্করের কাছেই এঁর প্রাথমিক তালিম শু হয়। কিন্তু অল্প বয়সেই পিতাকে হারান তাই বেশিদিন দিগম্বর পালুস্করের তালিম এঁর ভাগ্যে জোটেনি। তবে বাবার মৃত্যুর পরডি.ভি. পালুস্কর শিখতে শু করেন পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরের দুই সিনিয়র শিষ্য নারায়ণ রাও ব্যাস এবং বিনায়ক রাওপ ট্টবর্ধনের কাছে। অবশ্য নারায়ণ রাও বা বিনায়ক রাও-র গায়কীর সাথে ডি.ভি. পালুস্করের গায়কীর মিলের থেকে পার্থক্যই বেশি। অসাধরণ যে শ্রুতিমাধুর্যা ছিলো ওঁর গলায়, তা শুধুমাত্র বাঁশির কণ মিষ্টত্বর সঙ্গেই তুলনা করার যোগ্য। গোয়ালিয়রের চতুর্মুখী গায়কীর পুরোপুরি ছাপ পাওয়া যেত ওঁর গানে--খুব অল্প বয়সেই। তানে ওঁর সাবলীলতা আর লক্ষ্য করা যায়--যা উনি পুরোপুরি ওঁর বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। ওঁর গাওয়া ভজনগুলি সবই জনপ্রিয়, যেন "রঘুপতি রাঘব রাজারাম","যব জানকীনাথ","ঠুমক্‌ চলত রামচন্দ্র","পায়োজী ম্যায়নে রামরতন ধন পায়ো", "চলো মন গঙ্গাযমুনা তীর", ইত্যাদি। অকালমৃত্যুতে ডি.ভি. পালুস্করের জীবনদীপ নিভে যায় মাত্র ৩৪ বছর বয়সে(১৯৫৫ সালে),তবে ওঁর গাওয়া নিম্নলিখিত গানগুলি আজো অমর হয়ে আছে--
শ্রী বিলাসখানী তোড়ি মিয়াঁ কি মল্লার
মামোদ - নট আসাবরী মালকোঁষ
বাগেশ্রী কানাড়া গৌড় সারং কল্যাণ
ললিত হামীর বাহার
বিভাস তিলক কামোদ মারওয়া

বিনায়ক রাও পট্টবর্ধন

ইনি বিষ্ণু দিগম্বরের কাছ থেকে সরাসরি গোয়ালিয়র গায়কীর তালিম পেয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে এঁর গায়কীতে নাট্য সঙ্গীতের প্রভাব পড়ে, যা ওঁর পুত্র নারায়ণ পট্টবর্ধণের গানেও পাওয়া যায়। ডি. ভি. পালুস্কর এঁর কাছে তালিম নিয়েছিলেন--সে কথা তো আগেই বলেছি।
আনন্দী কেদার পুরিয়া আড়ানা
ভূপালী তোড়ি জয়জয়ন্তী ভজন ('অব কি টেক হমারি...')।
সুর মল্লার মিশ্র কাফি

নারায়ণ রাও ব্যাস
মারাঠী নাট্যসঙ্গীতের অনেকটাই প্রভাব পড়ে এঁর গানে যা ওঁর পুত্র বিদ্যাধর ব্যাসের গানেও পাওয়া যায়। এঁর স্টাইলকে মেলোড্রামটিক্ বললে অত্যুক্তি হয় না।
রামকৃষ্ণ বুয়া ওয়াঝে
হদ্দু হস্সুর তৃতীয় ভাই নাথ্থু খাঁ দত্তক নিয়েছিলেন নিসার হুসেনকে। ইনি পরবর্তীকালে বিখ্যাত হন 'বড়ে নিসার হুসেন খাঁ' নামে। এই বড়ে নিসার হুসেনের শিষ্য হলেন রামকৃষ্ণ বুয়া। এঁর পুত্র শিবরাম বুয়া এবং শিষ্য ভাস্কর রাও পরবতীকালে নাম করেন। রামকৃষ্ণ বুয়ার অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডিং এইচ. এম. ভি. থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে পাওয়া যায়--
ভাটিয়ার খামা বারওয়া খম্বাবতী
জৌনপুরী বৃন্দবনী সারং তিলক কামোদ কাফী মানাড়া
তোড়ি খট্ নট্বেহাগ মিয়াঁ মল্লার

কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিত
ইনি ছিলেন গোয়ালিয়রের শঙ্কররাও পণ্ডিতের পুত্র, যিনি ভাই একনাথ পণ্ডিতের সঙ্গে 'পণ্ডিত শাখা'র প্রবর্তন করেন। গোয়ালিয়র ঘরানায় এই পণ্ডিত পরিবারের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। নাথ্থু খাঁ ও তাঁর মৃত্যুর পরে বড়েনিসার হোসেন খাঁর কাছে তালিম পেয়েছিলেন শঙ্কর পণ্ডিত। কাজেই কৃষ্ণরাও শঙ্কর বাবার কাছে যথাযথ গোয়ালিয়র গায়কীরই প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। বড়ে নিসার হুসেনের কাছেও ইনি কিয়ৎকাল তালিম পেয়েছিলেন। লম্বা বহ্লাওয়া নিয়ে আলাপচারী, বোলতান, ফিরৎতান, ছুট্তান, আড়াই সপ্তক ধরে মীড়ের তান --এ সব কৃষ্ণরাওর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য। রহমত খাঁর পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণরাও পণ্ডিতকেই গোয়ালিয়রের শ্রেষ্ঠ খেয়ালিয়া বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে ওঁর আপাত ক্ষ পুযালি কণ্ঠই ওঁর গায়কীর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। তোড়ি হামীর (চতুরঙ্গ) কাফি টপ্পা (পঞ্জাবী)--তে কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিত এক কথায় অনবদ্য।

গজানন রাও যোশী
'গোয়ালিয়র' গায়কীকে জীবিত রাখার এবং মহারাষ্ট্রে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে যাঁর নাম সর্বাগ্রে করা হয়, সেই বালকৃষ্ণবুয়া ইচলকরঞ্জীকর-এর শিষ্য অনন্তবুয়া, অর্থাৎ অনন্ত মনোহর যোশীর পুত্র গজানন রাও যোশী। ইনিঅসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, এবং একজন সফল শিক্ষক হিসাবে বিখ্যাত। কণ্ঠসঙ্গীতের পাশাপাশি বেহালাতেওপরাদর্শী ছিলেন গজানন রাও যোশী -- যার প্রমাণ পাওয়া যায় বেহালায় ওঁর 'কেদারা' রাগের রেকর্ড শুনলে। গোয়ালিয়রের সমসাময়িক গায়কেরা যখন অধিকাংশই নাট্যসঙ্গীতের প্রভাব এড়াতে পারছে না, তখন গজানন রাও যোশী নির্ভেজাল গোয়ালিয়র গায়কী সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। তবে ওঁর তালিম যে শুধু গোয়ালিয়রেই হয়েছে তাইনয়, বিলায়েৎ হুসেন খাঁর কাছে 'আগ্রা'র তালিম, এমনকী জয়পুর-আত্রৌলির ভুর্জি খাঁ (ইনি আল্লাদিয়া খাঁর এবংমন্জি খাঁর ভাই--মল্লিকার্জ্জুন মনসুর-এর শিষ্য)-র কাছেও তালিম নিয়েছিলেন। তাই বড়ো আশ্চর্যজনকভাবে ইনিএকই আসরে পরপর গোয়ালিয়র আগ্রা এবং জয়পুর গায়কী বিশুদ্ধভাবে পেশ্ করতেন। গজানন রাও যোশীর 'আগ্রা' বা 'জয়পুর' গায়কীর পরিচয় পাওয়া এখন আর সম্ভব নয়, তবে ওঁর গোয়ালিয়র ঢঙে গাওয়া খেয়াল সহজলভ্য, যাতে আছে--ভীমলশ্রী, শ্রী, বসন্তবাহার, ভৈরবী। গজানন রাওর শিষ্য উল্লাস কুশালকর এই প্রজন্মের খ্যাতনামা শিল্পী। ইনিও গুর মতো বেশ দক্ষতার সঙ্গেই একই আসরে গোয়ালিয়র এবং জয়পুর গেয়ে থাকেন। এঁর কণ্ঠে বিশেষত 'দেশ' রাগের খেয়াল বড়োই সুশ্রাব্য এবং উপভোগ্য।

কুমার গন্ধর্ব
আসল নাম শিবপুত্র সিদ্ধারামাইয়া কোমকলি। সাত বছর বয়সে শঙ্কাচার্যের আদেশে ওঁর নাম পাল্টে রাখা হয় কুমার গন্ধর্ব। ১৯২৪ সালের ৮ই এপ্রিল কুমার গন্ধর্বের জন্ম এবং মাত্র এগারো বছর বয়সে মুম্বাই কন্ফারেন্সে আবির্ভাব। 'বিস্ময়বালক' হিসেবে তৎক্ষণাৎ তাঁকে চিহ্নিত করা হয়, কারণ শ্রোতারা এগারো বছরের ওই ছোকবার গলায় ফৈয়জ খাঁর নট্বেহাগ, আবদুল করিমের ভৈরবী ঠুংরী এবং ভাস্করবুয়ার তানের 'ক্যারিকেচার' শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। খুব শিগ্গিরই এরপর কুমার গন্ধর্ব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে মুম্বই ছেড়ে মধ্যপ্রদেশের দেওস গ্রামে ফিরে আসতে হয়। ফুটো হয়ে যাওয়া ফুসফুস নিয়ে স্রেফ দমের অভাবে এরপর উনি শু করেন এক নতুন, অভিনব গায়কী।প্রযেসর বি. আর. দেওধরের কাছে ইনি গোয়ালিয়রের যা তালিম পেয়েছিলেন, তার কোনো ছোঁওয়াই আর পাওয়াযায় না এঁর গানে--উধাও হয়ে যায় গোয়ালিয়র গায়কীর অধিকাংশ অঙ্গ। বদলে যা আসে, তা ওঙ্কারনাথ ঠাকুর ও আবদুল করিম খাঁর গায়কীর এবং জয়পুরী লয়কারীর সংমিশ্রণে প্রস্তুত হওয়া এক জগাখিচুড়ি -- যা পাব্লিসিটি ও হুড়োহুড়ির দৌলতে কুমার গন্ধর্বকে একজন শিল্পী থেকে একজন 'প্রোফেট্' বানিয়ে দিলো। ওঁর গানে ওঙ্কারনাথের অতিনাটকীয়তা এসে পড়ে--যা ওঁর genius কে ছাপিয়ে যায় এবং বেশ বিরক্তিকরভাবে অবস্থান করে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে। ওঁর গাওয়া জনপ্রিয় খেয়ালগুলি হলো---
তোড়ি চৈতিভূপ সাওনী
আহীর ভৈরব নন্দ মিশ্র বেহাগ
আল্হাইয়ো বিলাবল বাহার শুদ্ধ সারং
দেশ কামোদবন্তী গৌড় সারং
গোয়ালিয়রের আর তিন জনের প্রসঙ্গে গিয়ে এই ঘরানার দরজা এবার বন্ধ করবো।

এই তিনজনের মধ্যে প্রথম জন, অর্থাৎ বি.আর. দেওয়ারের কথা আগে বোধহয় বলা হয়েছে। ইনি ছিলেন বিষ্ণু দিগম্বরের অন্যতম সিনিয়র শিষ্য এবং কুমার গন্ধর্বের গু। ইনি গুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে 'জ্ঞানাচার্য পণ্ডিত পালুস্কার' নামে '৭১ সালে একটি বই লেখেন। Voice Culture -এর ওপর বি. আর. দেওধরের অনেক কাজ আছে, এবং এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষাদনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারাঠি ভাষায় 'আওয়াজ সাধনা' নামে '৭৯ সালে একটি বইও লেখেন। পাঠকদের মধ্যে কেউ ভাগ্যক্রমে মারাঠি জানলে দেওধারের লেখা বিভিন্ন শিল্পীর জীবনী সম্বলিত বইটি পড়ে দেখবেন। ভালো লাগবে। এঁর দুটি খেয়াল আপাতত পাওয়া যায়---
হিন্দোলবাহার (''কোয়েলিয়া বোলে'')
হিন্দুরা (''সাজ সাজ আওত হ্যায়'')।

এছাড়াও আছেন মিরাশী বুয়া। ইনি বালকৃষ্ণ ইচল করঞ্জীকরের শিষ্য, অর্থাৎ অন্তবুয়া ও বিষ্ণু দিগগম্বরের গুভাই। এঁর রেকর্ডে পাওয়া যায়---
আড়ানা ("আলা সাই সাজন")
বাহার ("নই ত্ নই ফুলি")।

গোয়ালিয়রের প্রদীপ টিমটিমে শিখায় এখনো যিনি ধরে আছেন, তিনি হলেন গোবিন্দ রাজুকারের কন্যা মালিনী রাজুরকার। এ বছর ইনি ষাটে পড়েছেন। এই পরিণত বয়সে শিল্পী বেশ ঠাহ্‌রান তথা বহ্‌লাওয়ার সাথে খেয়াল পরিবেশন করেছেন। টপ্পা গানেও মালিনী রাজুকার গোয়ালিয়রের ট্রাডিশিয়ান - কর্মকেই অনুসরন করে থাকেন। এবং তালিম মূলতঃ বাবা গোবিন্দ রাজুরকারের কাছেই, যিনি শঙ্কররাও পণ্ডিতের শিষ্য রাজাভাইয়া পুছওয়ালের কাছে তালিম পেয়েছিলেন। মালিনী রাজুরকারের গলায় 'জৌনপুরী' অথবা 'ইমন' অত্যন্ত সুন্দর রূপ নেয়।

রামপুর-সাহস্‌ওয়ান ঘরানা

আমরা গোয়ালিয়র ঘরানার ঠিকুজি - কুলজি আলোচনা প্রসঙ্গে হদ্দু খাঁ-হস্‌সু খাঁ ও নাথ্‌থু খাঁর নাম করেছিলাম। এই তিন ভাইয়ের মেজ ভাই হদ্দু খাঁ স াহেবের ছোট জামাই ছিলেন এনায়েৎ হুসেন খাঁ। এই এনায়েৎ হুসেনই হদ্দু খাঁর গোয়ালিয়র গায়কী সহস্‌ওয়ানে নিয়ে যান। এই সময়েই খেয়াল গান ঘরানা-ভিত্তিক এবং দরবার-কেন্দ্রিক হতে শু করে। রামপুরের দরবারে প্রথম দিকে ধ্রুপদ এবং বীণার চর্চা হলেও পরবর্তীকালে এই দরবারে খেয়ালও ঢুকে পড়ে এবং বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা খেয়ালিয়ার সম্মেলনে রামপুর দরবার সঙ্গীত দুনিয়ার অন্যতম কেন্দ্রস্থানীয় দরবার হিসেবে পরিচিতি পায়। নিকটবর্তী গ্রাম 'সহস্‌ওয়ান' থোক শিল্পীরা এসে জড়ো হন রামপুরের দরবারে এবং ফলতঃ গড়ে ওঠে রামপুর --সহস্‌ওয়ান ঘরানা, --যার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এনায়েৎ হুসেন খাঁর নাম আগেই উল্লেখ করেছি। এনায়েৎ হুসেন খাঁ খুব অল্প বয়সে রামপুরে বাহাদুর হুসেন খাঁর কাছে তালিম পেয়েছিলেন। এই বাহাদুর হুসেন খাঁই এনায়েৎকে বিখ্যাত মধ্যলয়ের 'তার ানা' শেখান --যা ক্রমশঃ রামপুর - সহস্‌ওয়ানের অন্যতম ফেভারিট হয়ে ওঠে নিসার হুসেন খাঁর হাত ধরে। এই 'তরানা' আজও এই ঘরের রশিদ খাঁ বেশ প ারদর্শিতার সাথে গেয়ে থাকেন। এই ঘরানার প্রধান দুজন শিল্পী হলেন--এনায়েৎ হুসেন খাঁর দুই জামাই--মুশ্‌তাক হুসেন এবং নিসার হুসেন খাঁ। শেষোক্তজনের শা গিরদ্ রশিদ খাঁ বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় এবং অবশ্যই প্রতিভাশালী একজন গায়ক। এই তিনজনকে নিয়েই আমরা আপাতত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যাবো। এই ঘরের যাঁদেরর গান আর শুনতে পাওয়া যাবে না, তাঁদের কথায় আর আসছিনা, এঁরা হলেন--হায়দার খাঁ এবং ফিদা হুসেন খাঁ।

মুশ্‌তাক হুসেন খাঁ

তিন সপ্তক জুড়ে অনায়াস লজদার তানকর্তবে বিখ্যাত ছিলেন মুশ্‌তাক হুসেন খাঁ। এই তানের প্রভাব এড়াতে পারেননি শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর, পরবর্তীকালে চিন্ময় লা হিড়ী এবং কে.জি. গিন্দে। মুশ্‌তাক হুসেনের শিক্ষা আরম্ভ হয় পিতা কহলন খাঁর কাছে. যিনি সহস্‌ওয়ানের প্রসিদ্ধ কাওয়াল হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারপর দাদা আশিক হুসেন, যিনি মামা পুত্তন খাঁ ও মেহবুব খাঁ-র কাছে মুশ্‌তাকের তালিম চল্‌তে থাকে। শেষোক্ত জন আত্‌রৌলি ঘরানার বিখ্যাত খেয়ালিয়া, যিনি 'দরস পিয়া' ছদ্মনামে অসংখ্য বন্দিশ রচনা করে গেছেন। এরপর মুশ্‌তাক হুসেন তালিম পান নিসার হুসেনের ঠাকুরদা, রামপুরের হায়দার খাঁর কাছে। তবে খেয়াল গানে মুশ্‌ত াক হুসেনের প্রকৃত গু হলেন ওঁর শ্বশুরমশাই এনায়েৎ হুসেন খাঁ--যাঁর কথা আগেই বলেছি। সব শেষে মুশ্‌তাক হুসেন বজীর খাঁর কাছে তালিম পান এবং রামপুরের নবাব হামিদ আলি খাঁর দরবারে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা পান। মুশ্‌তাগ হুসেন খাঁ যখন ১৯৬৪ সালে পদ্মভূষণ, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়ে মারা যান, তখন তাঁর বয়স প্রায় নববুই। মুশ্‌তাক হুসেন ধ্রুপদ - ধামার গাইতেন কিনা জানা যায় না, তবে ঠুংরী বা হালকা চালের মুড়কি সপাট তান--তার সপ্তকে চড়ে ফোয়ারার মতো ওঁর তান ওঠ া নামা করত। উৎসাহী পাঠকেরা খাঁ সাহেবেই শিষ্য নয়না সিং-এর লেখা নিউ দিল্লী সঙ্গীত অ্যাকাডেমি থেকে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত মুশ্‌তাক হুসেনের জীবনী গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন।
খাঁ সাহেবের যে সমস্ত গান রেকর্ড ও ক্যাসেটে পাওয়া যায়, তা হলো---

বেহাগ (খেয়াল ও তারানা) গান্ধারী (শুদ্ধ ঋষভ আসাবরী)
দেশ (তরানা) মীরাবাই কি মল্লার
সরপর্দা বিলাবল (টপ্পা) কাফি (টপ্পা-- "আজ গলে লগ্ যা")।

নিসার হুসেন খাঁ

নিসার হুসেন খাঁ রামপুর ঘরানার সবচেয়ে প্রভাবশালী এক বহুমুখী প্রতিভা। এঁর প্রাথমিক তালিম ঠাকুরদা হায়দর খাঁর কাছে। বাবা ফিদা হুসেনের কাছে উনি কে ানো তালিমই পাননি বলে শোনা যায়। পরবর্তীকালে নিসার হুসেন বরোদায় চলে যান এবং বরোদার রাজ দরবারে গাওয়ার সময়ে উনি ফৈয়াজ খাঁর গানের সংস্পর্শে আসেন ও ফৈয়াজী গায়কীর প্রচণ্ড ভক্ত হয়ে ওঠেন। ফৈয়াজ খাঁর শ্যালক আতা হুসেন খাঁর কাছে উনি কিছুদিন তালিমও নেন, ফলে নিসার হুসেন খাঁর প্রথম জীবনের রেকর্ডে আগ্রা গায়কীর, বিশেষ করে ফৈয়াজ খাঁর প্রভাব খুঁজে পাওয়াটা আশ্চর্যের বিষয় নায়। পরিণত বয়সে অবশ্য এ সমস্ত প্রভাব ধীরে ধীরে তঁ ার গায়কী থেকে অস্পষ্ট হয়ে মুছে যায়। নিসার হুসেন খাঁর গায়কীর মধ্যে যে নিজস্বতা ছিলো--ওঁর তারানা গানে যে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতো, তা বরাবর ওঁর শা গিরদ্দের, নিজেদের 'সাহস্‌ওয়ান' ঘরানার গায়ক বলে দাবী করতে উৎসাহ দিয়ে গেছে । বাল্যবয়স থেকেই নিসার হুসেন আর পাঁচজন বড় ওস্তাদদের শুনে কিছু কিছু 'চীজ্' নিজের গলায় বসিয়ে নিয়েছেন আর অসাধারণ রেওয়াজের দ্বারা নিজেকে নিজেই তৈরি করে নিয়েছেন। সে অর্থে ওঁকে একজন সম্পূর্ণ 'ত্রন্দ্বগুন্দ্র-প্পন্তুন্দ প্তত্তন্দন্তক্ক' বলতে কোনো বাধা নেই। নিসার হুসেন খাঁর গাওয়া যে সমস্ত রাগ রেকর্ডে বা খ্যাসেটে পাওয়া যায়, তা হলো--
আভোগী (এর সাথে নি, প বর্জিত 'বাগেশ্রী'র কোনো তফাৎ আছে বলে তো মনে হয় না)।
গোবর্ধনা টোড়ি ('তু আওরি আওরি')

ছায়ানাট ('সোগরী রাম কিরপা' এবং 'ঝনন ঝনন বাজে বিছুয়া') পাশাপাশি যদি ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের 'ছায়া' রাগেদ্রুত খেয়াল 'পবল চলত সনননন' শোনা যায়, ত াহলে এ কথা স্পষ্ট হবে যে, 'ছায়া' এবং 'ছায়ানট' --মূলত একই রাগ, অন্তত এদের চল একই। কেন যে এর দুটি নাম হলো--তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। আসলে ছ ায়া ও ছায়ানটের তফাৎ অনেকটা ইমন ও ইমন কল্যাণ অথবা শুদ্ধ ও শুদ্ধ কল্যাণের মতো।

রশিদ খাঁ

বর্তমান প্রজন্মের সবচেয়ে বিশুদ্ধ তথা শক্তিশালী গায়ক। মাত্র ছ'বছর বয়স থেকে রশিদ খাঁ বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত। কোলকাতা সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমীতেই শু হয় ওঁর তালিম। রামপুর-সাহ্‌সওয়ানের কিংবদন্তী ওস্তাদনিসার হুসেন খাঁর কাছেই তামিল সম্পূর্ণ হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য ওস্তাদের মেয়েকে বিবাহ করতে রাজী ন হওয়ায় রশিদকে নিসার হুসেনের বিরাগভাজন হতে হয় এবং গুকুল থেকে বিতাড়িতও হতে হয়, তবে রশিদ খাঁর গায়কী মূলত রামপুরেরই গায়কী এবং নিসার হুসেন খাঁর দ্বারই নির্মিত। ইদানীয় অবশ্য রশিদ খাঁর গানে, বিশেষ করেওঁর আলাপ আওয়ারে ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর তা আপত্তিকরও নয়, কারণ এতে রশিদের কণ্ঠে যে গভীরতা ও 'ঠাহ্‌রান' এসেছে--তা শ্রোতাকে অনেক বেশি করে মুগ্ধ করছে।* ফলে রশিদ খাঁ আগের থেকে অনেক বেশি উৎসাহের সঙ্গে এখন বড়হতের দিকে মনযোগ দিচ্ছেন। রশিদ খাঁ যখন তাঁর অসামান্য কণ্ঠে আত্মমগ্ন হয়ে ধীরে ধীরে আলাপ, তান, সরগম, বহ্‌লাওয়া নিয়ে মেলে ধরেন সংশ্লিষ্ট রাগ রূপটিকে--তখন ওঁর ধারেকাছে কোনো শিল্পী আসতে পারেন না। জটিল কিছু কিছু phrase এর ব্যবহার, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে করা তান ও সরগম--এসবই এক নতুন style -এর জন্ম দিয়েছে--যা একান্তভাবেই শিল্পীর নিজের। রশিদের 'তরানা' অবশ্য পুরোপুরি ওস্তাদ নিসার হুসেনকে অনুসরণ করে। 'তারানা' গানে যে তৈয়ারী ও সূক্ষ্ম বোলতানের ব্যবহার দরকার--তার পুনরূপ প্রকাশিত হয় রশিদ খাঁর গানে। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে (জন্ম--১ জুলাই, ১৯৬৬) রশিদ খাঁ নিজেকেযে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন --তার ফল যথাযথ পাকবে যদি আগামি দিনে শিল্পী আরো বেশি বন্দেশী নির্ভর গানে মনোনিবেশ করেন। রশিদ খাঁর গাওয়া কয়েকটি জনপ্রিয় খেয়াল--*** 'ললিত' রাগে গাওয়া বন্দিশ 'কহাঁ জাগে রাত' আমীর খাঁ ও রশিদ খাঁর গলায় পর পর শুনলেই এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

*** শ্যাম কল্যাণ ('পায়েল মোলি বাজে') ঝিঝোঁটি (তরানা)

রাগেশ্রী বাহার ('মত্‌ওয়ারি কোয়েলিয়া')

যোগ দেশ ('করম কর দিজে')

আভোগী যায়ানট ('ঝনন ঝনন বাজে বিছুয়া')

মধুবন্দী ('তোরে গুণ গাও'/ 'উন সো মোরি লগন লাগি') বেহাগ

জয়পুর - আত্‌রৌলি ঘরানা

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাঘে যে সঙ্গীত সাধকের হাত ধরে জয়পুর - আত্‌রৌলি ঘরানার জন্ম হয়--তিনি হলেন ওস্তাদআল্লাদিয়া খাঁ, যাকে সেই সময়কার তাবড় তাবড় শিল্পীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন genius বলা যায়। গজানন রাও যোশী তাঁর 'Down Memory Lane' নামক বইতে আল্লাদিয়া খাঁর 'Musical brain' এবং 'architecturalinsight' কেই জয়পুর ঘরানার কূট ও বক্রগতির রাগদারীর কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে যে কয়েকটি হাতে-গোনা ধ্রুপদ - ভাঙা ঘরানার নাম পাই, তার মধ্যে এই ঘরানা অন্যতম। দুষ্প্রাপ্য এবং তথাকথিত অপ্রচলিত রাগের পরিবেশনায় এই ঘরানার শিল্পীদের প্রসিদ্ধি আছে। এই ঘরানায় গায়কীর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো অত্যন্ত জটিল তথা পেঁচ বহ্‌লাওয়ার ক্ষেত্রেও সঠিক ও যথাযথভাবে সুরের ওপর আধিপত্য।। আমি নিজে কিরানা, বা সাহস্‌ওয়ান, বা পালিয়ালার অনেক শিল্পীকে সুর থেকে কিঞ্চিৎ পিছলে যেতে শুনেছি, ---কিন্তু জয়পুরের গায়কদের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটা অসম্ভব। দম ও শ্বাস ভরা তান, মধ্যলয়ে রাগের উন্মোচন এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, আগাগোড়া এক অবিচ্ছেদ্য স্তুঙ্কন্দ্ধন্ডভ্রন্দ্ধস্ত রেখে চলা--এই গায়কীর বৈশিষ্ট্য। কিরানা বা তুলনা মূলক ভাবে পরবর্তীকালে সৃষ্ট ঘরানাগুলির ঢিলে - ঢালা বাঁধুনির সম্পূর্ণ বিপরীত এই প্রাচীন ঘরানাটির সূত্রসম্পূর্ণ সুর ও লয়ে নিবদ্ধ, তরঙ্গায়িত সৌন্দর্যে বাঁধা গায়কী। 'আ' -কার মাত্রিক আলাপ এই ঘরের গায়কদের বিশেষ পছন্দের। তবে সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, এই ঘরে দ্রুত খেয়াল বা ছোটো খেয়াল প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না--বললেই চলে। বিলম্বিত রচনায় মধ্যলয় তিনতাল অথবা রূপক তালই বেশি শোনা যায়। খেয়াল ছাড়া এই ঘরানার কাউকে ঠুংরী, তারানা, সাদ্‌রা, টপ্‌খেয়াল ইত্যাদি গাইতে খুব বেশি শুনিনি--এক কেসরীবাই ও মোঘুবাইকে ছাড়া। ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের এই গরানার গায়কী ভীষণই পছন্দের। কারণ এর সাথে যে কোথাও আধুনিক কবিতা--উপন্যাসের যোগাযোগ খুঁজে পাই। এই ঘরের রাগদারী এবং কূটতান জটিল হওয়ার কারণেই শ্রোতার বাড়তি মনোযোগ দাবী করে। আয়েস করে শুয়ে-বসে যেমন কবিতা পড়ার দিন আর নেই, এখন কবিতা পড়তে গেলে যেমন পুরোপুরিব্রিব্ধব্দ্ধন্ব্দ্ধন্ক্ষ এবং devotion পাঠককে দিয়ে দিতে হয়, তেমনি এই ঘরানার গায়কীকে বুঝবার জন্যে শ্রোতাকে উৎকর্ণ হয়ে নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে শুনতে হয়। 'আগ্রা'র উত্তেজক আভিজাত্য অথবা 'কিরানা'র 'ন্দ্বপ্পস্পব্ধন্নন্দ্ধব্রন্মান্দ্বপ্প' --এই গায়কীতে পুরোমাত্রায় থাকলেও যে জিনিসটা এখানে সবচেয়ে বেশি গুত্ব পায় তা হলো -এর একান্ত 'ড়ন্দ্ধড় ন্ব্দ্ধন্দ্বপ্তপ্তন্দ্বস্তব্ধস্তুপ্ত স্তুঙ্কব্দ্ধন্দ্ধ' ইচ্ছে করেই কথাগুলো কথা ইংরাজীতে লিখলাম। কারণ কথাগুলো আমার নয়। সমকালীন একজনের। নামটা না-ই বললাম। খুব দুঃখের কথা এই যে বর্তমানে এই ঘরানার গায়কী আর ততোটা জনপ্রিয় নয়। এখন মল্লিকার্জ্জুণ মনসুর বা কেসরবাই কিছু রেকর্ড ও ক্যাসেট ছাড়া --এই ঘরের অন্য কোনো শিল্পীর তেমন কিছু গান শোনার অবকাশ খুবই কম। মোঘুবাই কুর্দিকরের কিছু দুষ্প্রাপ্য রেকডিং আছেতেমনি বাজারে দুষ্প্রাপ্য তানিবাই, লক্ষ্মীবাই বা নিবত্তিবুয়া সরনায়েকের গান। মোঘুবাই-এর সুকন্যা কিশোরী আমুনকর অবশ্য বিগত কয়েক বছর ধরেই শ্রোতাকে আনন্দ দিয়ে আসছেন।এঁর ক্যাসেট অবশ্যই বাজারে ছড়াছড়ি। জয়পুর ঘরানার সম্ভবত সবচেয়ে প্রতিভাশালী শিল্পী মন্‌জি খাঁর কেন যে কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় না--তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। ফৈয়জ খাঁ এবং আবদুল করিমের সমসায়য়িক হলেও স্বয়ং আল্লাদিয়া খাঁর কোনো রেকর্ড নেই কেন-- তারও কোনো ব্যাখ্যা নেই। মন্‌জি খাঁ ছাড়াও আল্লাদিয়া খাঁর আরেকজন ছেলে ভুর্জি খাঁর কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় না। তেমনি পাওয়া যায় না জয়পুরের সবচেয়ে বড়ো মহিলা শিল্পী, আল্লাদিয়া খাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যা (অনেকের মতে) তানিবাইয়ের কোনো রেকর্ড। সম্প্রতি H.M.V. থেকে লক্ষ্মীবাই, মোঘুবাই, পদ্মাবতী, শালিগ্রাম ও পদ্মাবতী গোখেলের কিছু সুপ্রাচীন রেকর্ডিং প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য--

লক্ষ্মীবাই যাদব দেশ্‌কর, ইমন, পিলু, কাফি, তিলং

পদ্মাবতী শালিগ্রাম তোড়ি, পূর্ব্বী, মিশ্র পিলু, তিলক কামোদ, ভৈরবী

পদ্মাবতী গোখেল মিশ্র পিলু, কামোদ।

আল্লাদিয়া খাঁর শিষ্যদের মধ্যে সিনিয়র মোস্ট্‌ শিষ্য নির্বত্তিবুয়া সরনায়েকের মাত্র একটিই রেকর্ডিং বাজারে উপলব্ধ, তা হলো--রাগ শুদ্ধ কল্যাণ। এই রেকডিং-এ বুয়ার সাথে সঙ্গতে ছিলেন সুরেশ তল্‌ওয়ালকার (তবলা) এবং আবদুল লতিফ (সারেঙ্গী)।

মোঘুবাই কুর্দিকর

আল্লাদিয়া খাঁর কাছে সরাসরি তালিম পেয়েছিলেন মোঘুবাই কুর্দিকর। আমার বরাবরই ব্যক্তিগতভাবে মোঘুবাইয়ের গান এই ঘরের অন্যান্য শিল্পীদের চেয়ে অনেক বেশি ভালো লাগে। বিশেষ করে কেসরবাইয়ের থেকে তো বটেই।কেসরবাইয়ের তৈয়ারি ও অক্লান্ত রেওয়াজিতে এক অসম্ভব চটক ছিলো, কিন্তু ছিলো না মোঘুবাইয়ের গভীরতা, স্বকীয়তা এবং বিশুদ্ধতা। মোঘুবাইয়ের গানের সঙ্গে 'সুন্দর'--এই বিশেষণটি ছাড়া অন্য কোনো অলংকার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আম াদের প্রজন্মের দুর্ভাগ্য, এতো বড়ো একজন শিল্পীকে শুনতে পাওয়ার সুযোগ এখন খুবই কম। 'আকাশবাণী'র ভীষণ সমৃদ্ধ তথা সুপ্রাচীন 'খজানা' কে সদ্ব্যবহার কর ার কথা কেন যে মিউজিক কোম্পানীগুলির মাথায় আসে না, কে জানে! যা-ও বা দু-একটা ট্র.ঢ.স্থ. -এর সরাসরি রেকডিং পাওয়া যায়, তা-ও সে বহুশ্রুত কোনো শিল্পীর। মোঘুবাইয়ের রেকর্ড করা নিম্নলিখিত আটটি খেয়াল আকাশবাণীর সংগ্রহশালায় সযত্নে সংরক্ষিত (?) আছে। তা শোনার সুযোগ কতোটুকু হয়--এই প্রজন্মের শ্রোতাদের ?

হিন্দোল সাওনী ইমন সুহা
বাগেশ্রী তরানা জয়জয়ন্তী কেদার নায়কী কানাড়া

এর মধ্যে একমাত্র আশার কথা, অতি সম্প্রতি এইচ.এম.ভি. থেকে অবশেষে মোঘুবাইয়ের একখানি খেয়াল প্রকাশিত হয়েছে। তা হলো 'আল্হাইয়া বিলাবল' -এর জনপ্রিয় বন্দিশ 'কাহে লজায়েরে পিয়া'।

কেসরবাই কেরকার

কেসরবাইয়ের স্বর লাগানো বেশ গম্ভীর প্রকৃতির-এবং অবশ্যই অসম্ভব বিশুদ্ধ 'আ'কার মাত্রিক। কেসরবাই নিজে আল্লাদিয়া খাঁর কাছে সম্পূর্ণ তালিম নিলেও ওঁর গায়কীতে যথেষ্ট পরিমাণে গোয়ালিয়রের ছাপ পাওয়া যায়, আর তার কারণ, কেসরবাই প্রথমদিকে রামকৃষ্ণবুয়া এবং ভাস্কর বুয়া বাখ্লের কাছে গোয়ালিয়র অঙ্গে তালিম নিয়েছিলেন। তবে আল্লাদিয়া খাঁই কেসরবাইয়ের যাবতীয় স্টাইল ও জয়পুর গায়কী নির্মাণ করে দিয়ে যান। ৭০ বছরে পৌঁছেও এই মহিলা যে ক্ষমতা ও তৈয়ারি নিয়ে গান করতেন--তা ওঁর পুর্বজীবনের গানের থেকে একটুও সরে আসেনি।পুরো। ব্যাপারটার পেছনেই কাজ করেছিলো আল্লাদিয়া খাঁর প্পব্দব্ধন্দব্জ প্পন্দস্তু এবং কেসরবাইয়ের নিজস্ব অক্লান্ত সাধনা ও রেওয়াজি perfection. নিজের সময়ে ওঁর মতো এতো খ্যাতি ও সম্মান--অন্য কোনো শিল্পী পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। গলার ভল্যুম, রেঞ্জ আর পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি কেসরবাইয়ের ছিলো অসম্ভব জটিল ও বক্রগতির তানের ভাণ্ডার --যা কমবেশি এই ঘরানার প্রায় সমস্ত শিল্পীরই আয়ত্তে ছিলো। তিন সপ্তক জুড়ে প্রচুর গমক ওআস - দমের তান কেসরবাইয়ের গলায় শোনা--সারা জীবনের এক অন্যতম অভিজ্ঞতা। মহিলা তানকর্তবের ব্যাপারে কিরানার রোশনারা বেগম এবং জয়পুরের মোঘুবাইয়ের পাশাপাশি কেসরবাইয়ের তানই আমার একমাত্র ভালো লাগে। এঁর মূলতঃ খেয়ালই শুনতে পাওয়া গেলেও কয়েকটি ঠুংরী ও ভজন কেসরবাই রেকর্ড করেছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় --ভজন ''মেরো ক্যা বিগাড়েগা'' এবং ভৈরবী ঠুংরী-- ''ক্যায়সে সামঝাউঁ।'' ওঁর গাওয়া কয়েকটি বিখ্যাত খেয়াল হলো---

বিভাস ললিতা গৌরী চৈতি নট্ কামোদ
ললিত খট্ মূলতানী তিলক কামোদ
কুকুভ বিলাবল খোকর তোড়ি আনন্দী / নন্দ্
জৌনপুরী হিন্দোল - বাহার মাণ্ড দুর্গা
দেশি সুঘরাই পুরিয়া ধ্যানশ্রী মাবেহাগ
নট্ বেহাগ গৌড় মল্লার জয়জয়ন্তী শংকরা
হোরি খামাজ বিহাগড়া মালকোঁষ পরজ

মাল্লিকার্জুন মনসুর

মল্লিকার্জুন মনসুরের গানের সঙ্গে আমার পরিচিতি ঘটে কোনো এক বর্ষার রাতে। আকাশবাণীর দৌলতে। আকাশবাণী থেকে রাত দুপুরে প্রচারিত কালোয়াতি গ ানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক দিন থেকেই। তা এমনই এক বর্ষার রাতে শুনলাম বুয়ার গাওয়া নট্‌বেহাগের বন্দিশ 'ঝন ঝন ঝন ঝন পায়েল বাজে'। সেই বাদলা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাটেতো আমি ভিজছিলামই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত সুন্দর গানের ঝর্ণাধারায় আমি ভেতরে ভেতরে সিক্ত হয়েউঠেছিলাম। তার প্রভাব আ মি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। এই গান আগে ফৈয়াজ খাঁ এবং এই ঘরেরই আন্জানীবাইয়ের গলায় শুনেছি। ফৈয়াজ খাঁর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তানের গে োলাবাদ ছোটানো কানে বসে ছিলো। মল্লিকার্জুনের এইগান সম্পূর্ণ জয়পুরী ঢঙে, মধ্যলয়ে অত্যন্ত জটিল তানকর্তবের সঙ্গে, আরো রঙিন হয়ে উঠলো--আরো বড়হত আর সৌন্দর্যে সে গান যেভাবে আমি শুনেছিলাম--তার সাথে স্বর্গীয় সুখের খুব বেশি একটা পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। সেদিন বুয়ার কন্ঠের জাদুতে যে সৌন্দর্যের সন্ধান আমি পেয়েছিলাম--তা শুধু আমার গান শোনার কানকেই নয়, কতকটা আমার জীবনবোধকেই বদলে দিয়েছিলো। অনেকটাই পরিণত ও সুরে বঁ াধা সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম আমি সেইদিন। আমার মতো করে। কিছুটা ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রসঙ্গে এসে গেল। আসলে মল্লিকার্জুনের সম্পর্কে বলতে বসলে আমি প্রায়ই নালে-ঝোলে হয়ে পড়ি।

মল্লিকার্জুন মনসুরের জন্ম হয় ৩১শে ডিসেম্বর ১৯১০ সালে, কর্ণাটকে। প্রথম জীবনে নীলকণ্ঠ বুয়ার কাছে ছ' বছর গোয়ালিয়র গায়কীর তালিম পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাদিয়া খাঁর বড় ছেলে মন্জি খাঁর কাছে মল্লিকাজ্জুন তালিম নিয়েছিলেন। এই মন্জি খাঁর তালিমের তত্ত্বাবধানেই এঁর জয়পুরী ঢঙের শিক্ষা অ ারম্ভ হয়। মন্জি খাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আল্লাদিয়া খাঁর ছোটো ছেলে ভূর্জি খাঁ মল্লিকার্জুনের তালিমের ভার নেন। ১৯৩১ সালে প্রথম ওঁর কিছু রেকর্ডিং প্রকা শিত হয়--সবকটিই ৭৮ আর.পি.এম. ডিস্কে। প্রথম দিকের সেইসমস্ত রেকডিং শুনলে মল্লিকার্জ্জুনের প্রকৃত গায়কী (যা ওঁর পরিণত বয়সে অনেক বেশি উন্মোচিত হয়)র সম্পর্কে হয়তো সঠিক ধারণা করা যাবে না। এই সমস্ত ছোটো খেয়ালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য --(এগুলি ক্যাসেটে কিনতেও পাওয়া যায়)

আল্হাইয়া বিলাবল মিশ্র মাণ্ড ছায়ানট জংলা
জৌনপুরী ভীমপলশ্রী দেশ কাফি ভজন
তোড়ি পুরিয়া আড়ানা মালকোঁষ
সারং দুর্গা কর্ণাটকী কাফি ভৈরবী

তবে মল্লিকাজ্জুনের গানে যাবতীয় ঠাহ্রান ও গভীরতা আসে ওঁর পরিণত বয়সে--উনি শ্রোতামহলে পরিচিতি পান অনেক পরে--যখন ওঁর গায়কী, অর্থাৎ জয়পুর-

-আত্‌রৌলি গায়কী ক্রমশ লুপ্ত হতে বসেছে। জয়পুরের পেটেন্ট্ কিছু স্টাইল যেমন জটিল রাগদারী, বহ্‌লাওয়া ও তানের বক্রগতি এবং স্থায়ী - ভরা এসবই মল্লিকার্জুনের গলায় বসে ওঁর পরবর্তী জীবনে--মন্‌জি খাঁ ও ভুর্জি খাঁর কাছে তালিম নেওয়ার পর। শোনা যায় জয়পুর ঘরানার দিক্‌পাল স্রষ্টা আল্লাদিয়া খাঁরও স্নেহধন্য ছিলেন মল্লিকার্জুন। আখ্‌তারী বাই ওঁকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যেতে চাইলে বড় খাঁ সাহেব কোনো মতেই রাজী হননি। মল্লিকাজুনের কণ্ঠের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট হলো--তার মাধুর্য্য -এক অপূর্ব রসের খনি--যা ফুরোবার নয়। ওঁর নানা অপ্রচলিত রাগের স্টক্‌ও প্রচুর। ধীর বোল-আলাপ থেকে হঠাৎ এক লম্বা হলক্ তানে লা ফিয়ে পড়া অথবা ভয়ানক পেঁচ ও কূট লয়কারীর সাহায্যে দুলতে দুলতে সমে ফিরে আসা (বিশেষ করে ওঁর গাওয়া 'খট্' রাগে 'বিদ্যাধর গুণীজন' শুনলে একথার প্রমাণ মিলবে) --এ সবই মল্লিকার্জুনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ওঁর গানে কখনো কখনো যে দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী শাস্তীয় সঙ্গীতের প্রভাব পাওয়া যায় --তা এসেছিলো প্রথম জীবনে শ্রীঅপ্পায়াস্বামীয় কাছে কর্ণাটকী সঙ্গীতে তালিম নেওয়ার সময় থেকেই। মল্লিকার্জুনকে তাঁর সঙ্গীত জীবনের শেষ লগ্নে সঙ্গীত-নাটক-অ্যাকাডেমী পুরস্কার, পদ্মভূষণ, কালিদাস সম্মান এবং সবশেষে পদ্মবিভূষণ ইত্যাদিতে ভূষিত করা হয়। ৮২ বছর বয়সে এসে ১৯৯২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ কয়েকটি বছরেও যে কী অসম্ভব ভালো গান বুয়া করেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যাবে' ৮১ সালের রেকর্ডি-এ 'মারওয়া' এবং '৮৮ সালের রেকর্ডিং এ 'শিবমত ভৈরব' এবং 'সাওনী' শুনলে। প্রথম রেকর্ডিং গৃহীত হয়েছিল মুম্বাইতে বড়ে গোলামের স্মরণ সভায় এবং দ্বিতীয়টি আহ্‌মেদাবাদে সকালের রাগের উৎসবে। বিশেষ করে বুয়ার 'মারওয়া'--তে আন্দোলিত ধৈবতের ব্যবহার--মাধ্যমকে ছুঁতে ছুঁতেও ফিরে আসা-- ওঁর জাত চিনিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

মল্লিকার্জুনের 'বেহাগড়া'র গান 'ইয়ে প্যারী পগ্ হোলে'তে 'গম পগ' আর 'গরস'কে বগলদাবা করে 'ছুট্'-এর উল্লম্ফন, বা'সুঘরাই'তে কোমল গান্ধারের ভীষণ effective প্রয়োগ, বা 'শুদ্ধনটে'র শৃঙ্গার রস-সিক্ত romantic appeal অথবা 'শুক্লা বিলাবল'-এ অত্যন্ত চিসম্মত উপায়ে সগগম--ফ্লেজের পুনঃপুনঃ আবর্তন--কতোবার, কতোভাবে যে আমাকে কাঁদিয়েছে--তার ইয়াত্তা নেই। সে যা হোক, কথাকে বেশি বাড়তে দিতে নেই। তাই পঠক ও উৎসাহী শ্রোতার সুবিধার্থে নীচে মল্লিকার্জুন মনসুরের গাওয়া কতোগুলি উল্লেখয়োগ্য খেয়ালের তালিকা দেওয়া হলো--

ভীমপলশ্রী কুকুভ বিলাবল ললিতা গৌরী
রামদাসী মল্লার আনন্দী নায়কী কানাড়া
বাসন্তী কেদার খট্ কাফি কানাড়া
বাসন্তী কানাড়া নট্ বেহাগ বিহারী
শুক্লা বিলাবল বাহাদুরী তোড়ী এক নিষাদ বেহাগড়া
রইমা কানাড়া ইমনী বিলাবল সরোথ / সোরথ্
আদম্বরী কেদার গৌড় মল্লার শুদ্ধ নট্

পাতিয়ালা ঘরানা
গোয়ালিয়ারের পেট চিরে যে কয়েকটি ঘরানা জন্ম নিয়েছে, তার মধ্যে আধুনিকতম ঘরানাটি হলো 'পাতিয়ালা' ঘরানা। খেয়াল গানের ইতিহাসে 'পাতিয়ালা' ঘরানার ওস্তাদ কালে খাঁ ও বড়ে গোলাম আলি ছাড়া আর কারো নাম ততোটা আলোচিত হয় না। আসলে এই ঘরের সবচেয়ে বড়ো আবদান বোধ হয় ঠুংরী। পাঞ্জাবী টপ্পা-ভাঙা ঠুংরী এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য --যা বেনারসের খেয়াল অঙ্গের ঠুংরী অথবা লক্ষ্ণৌয়ের নৃত্য-সম্পর্কিত টুংরীর থেকে অনেকটাই আলাদা। বড়ে গোলাম আলীর হাতে এই ঠুংরী গান এক অসাধারণ শৃঙ্গার রসাত্মক রূপ নেয়। তবে, ঠুংরী গানের কথা আমরা পরে আলোচনা করবো। পাতিয়ালার খেয়াল গায়কীর প্রায় সবটাই জুড়ে আছেন বড়ে গোলাম। এই গায়কীর বহ্‌লাওয়া পদ্ধতি, আরোহীতে ছুট্, তান, হলকতান, আর ফিরতের দ্রুত স্পিডে সপাট তান সম্ভবতঃ গোয়ালিয়রেরই অবদান। গোয়ালিয়রের কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিত ও পাতিয়ালার বড়ে গোলামের গান পরপর শুনলেই এর প্রমাণপাওয়া যাবে। তবে গোয়ালিয়রের বিশুদ্ধ রাগদারীর সঙ্গে দু'ফোঁটা পঞ্জাবী হরকত্ যে এই টনিকে মিশ্রিত হয়েছে--একথা যে কেউ মেনে নেবেন। এই মিক্‌স্চারে ফলে বড়ে গোলাম ও ওঁর ওস্তাদ কালে খাঁ ছাড়া এই ঘরের অন্য কোনো শিল্পীর দাপাদাপিতে বড়ো একটা শ্রুতিমধুর হয়েছে--এ কথা বলতে পারি না। 'পাতিয়ালা' ঘরানার জনক হিসাবে আলিয়া কত্তুর নাম করা হয়, এঁরা ছিলেন দুই ভাই-আলি বখ্‌শ্ খাঁ ফতে আলি খাঁ। রাগদারী ও সুরের সাচ্চাইয়ের থেকে অক্লান্ত তানের সৃষ্টি আর গলা ঘোরানোর দিকেই এই দুই ভাইয়ের লক্ষ্য ছিলো বেশি। এঁদের হাত ধরেই পাতিয়ালায় প্রবেশ করে 'আ'-এর বদলে 'অ্যা' কারের ব্যবহার ও তেঁৎরা তান। এই তেঁৎরা তানের অতসবাজি ছোটাতে শুনেছি সলামত-নাকজত আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সলামত আগি--নজাকত আলি খাঁ নিজেদের 'শাম চুরাশি' ঘরানার গাইয়ে বলে দাবী করতেন। 'পাতিয়ালা' ঘরানাকে অস্বীকার করতেন এবং অকারণে সুযোগ পেলেই বড়ে গোলামের নিন্দা করতে ছাড়তেন না। যাঁরা এঁদের তালবাজির ফান্দায় পড়ে গেছেন--তাঁদের নিশ্চয়ই এঁদের গাওয়া 'পূরবী', 'পাহাড়ী' ও 'আভোগী কানাড়া' ভালো লাগবে। এর ফলে কতোটা রাগদারী বজায় থাকে --তা বিশেজ্ঞরাই বুঝে দেখবেন। তবে এহেন হরকত্ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই পছন্দ করতেন না, যেমন কিরানার তারাপদ চক্রবর্তী মশাই। তিনি তো এ জিনিসকে সরারসি 'বিড়াল কুকুরের ঝগড়া' বলেই দাবী করে বসেছিলেন একবার ! আলিয়া কত্তুর ফতে আলি খাঁর কাছে বড়ে গোলামের চাচা কালে খাঁ গিয়ে হাজির হলেন। এই কালেখাঁর গান খুব কম শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে যুগে কালে খাঁ ভয়ানক প্রশংসিত হন--তৎকালীন বিদগ্ধ মহলে। অমিয়নাথ সান্যাল তাঁর 'স্মৃতির অতলে' বইতে কালে খাঁর কণ্ঠের স্নিগ্ধ ও গম্ভির --কোমলতার প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হননি--এমন কী এঁকে আবদুল করিম খাঁর সঙ্গে তুলনাও করেছেন। অমিয়নাথবাবুর মতে আবদুল করিমের কণ্ঠ যদি এস্রাজের আওয়াজ হয়, কালে খাঁর কণ্ঠ তাহলে অবশ্যই সারেঙ্গীর আওয়াজের সঙ্গে সদৃশ। এহেন কালে খাঁর কাছে সাত বছর ধরে তালিম পেয়েছিলেন বড়ে গোলাম আলি খাঁ। ওঁর কথা যথাস্থানে বলবো, তরে এই ঘরানার বর্তমান প্রজন্মের শিল্পী অজয় চক্রবর্তী, উপযুক্ত তালিম পাওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ জলসায় যেভাবে চমক প্রদর্শনীতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং কিম্ভূতকিমাকার যশরাজ--মার্কা উল্লম্ফনে মেতে উঠেছেন--তাতে রাগরূপ কতোটা বজায় থাকছে তা সমালোচকেরাই বলবেন। তবে অজয় চক্রবর্তী অত্যন্ত সুকণ্ঠের অধিকারী এবং গায়কীতে অসাধারণত্বের যথেষ্ট ছাপ রয়েছে --তিনি যদি টি.ভি. সিরিয়ালের গান, বা অ্যালবামের গানের ঢঙে সঙ্গীত পরিবেশন ছেড়ে আর একটা ঠাহ্‌রান ও বড়্‌হত নিয়ে রাগবিস্তারে মন দেন--তাহলে আমরা, এই প্রজন্মের শ্রোতারা অনেক বেশি উপকৃত হই।

বড়ে গোলাম আলি খাঁ
আমীর খাঁ ছাড়া আর যে শিল্পীর গায়কী বিগত কয়েক দশক ধরে শ্রোতামহলে জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পেরেছে, তিনি অবশ্যই, এক এবং অদ্বিতীয় বড়ে গোলাম আলি। এর জন্যে খাঁ সাহেবের জাদুকরী কণ্ঠের melody এবং emotive appeal ই দায়ী। বড়ে গোলামের গায়কীর উৎস যে গোয়ালিয়র--তা আগেই বলেছি। তরে ওঁর গানে যে জিনিসটি সবথেকে আগে উঠে আসে, তা হলো ওঁর একান্ত নিজস্ব শিল্পী সত্তা, যা ওঁর গানকে চলাচলের মুক্তপথ হিসাবে তুলে ধরতে স

াহায্য করে। এক অমোঘ সৌন্দর্য ও সৃষ্টিকল্পের সন্ধান দেয়--যা কোনো রক্তমাংসের দিব্যি জ্বলজ্যান্ত মানুষের গলা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বলে অনেক সময়ে বিশ্বাসই হতে চায় না। গমক, মুড়কির তান, জমজমা, মীড় ছুট, সপাট তান--এ সমস্ত অলংকার যে অনায়াসে খাঁ সাহেবের আইসক্রিমের মতো গলা থেকে গলে গলে নামতেথাকে--তা অন্য কোনো শিল্পীর কাছে পেয়েছি বলে তো মনে হয় না। বড়ে গোলামের গলার রবাবের মতো নমনীয়তা বা flexibilityর কথা বলতে বলতে পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলা যায়., তবে সেই প্রসঙ্গে আসার জন্য আমাদের, ওঁর স্বরযন্ত্রের আণুবীক্ষণিক ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা দরকার--যে রহস্যের সমাধান করা কোনো তদন্তেই সম্ভব নয়। কাজেই মাটির ওপরে, আকাশের দিকেমুখ রেখে দাঁড়িয়ে রং - বেরঙের খেলা, আতসবাজি, ফুলঝুরি, হাউই,রকেটের মেলা--সঙ্গীত জগতে শ্রেষ্ঠ বাজিকরের কাজ --দেখা (নাকি শোনা?) ছাড়া আর কী ই বা করার আছে আমাদের? কোমলতা বজায় রেখেও পৌষের সাথে তিন সপ্তকে ছুটে বেড়ানো --কোনো অতি নাটকীয়তা বা তীক্ষ্নতা ছাড়াই কিভাবে সম্ভব তার জন্য 'দম্পসনন্তন্দ্ব ট্রত্তপুদ্ধত্তজন্দ্ব'-এর বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্য যথেষ্ট কি ?

বড়ে গোলামের বিলম্বিত খেয়ালে মধ্যলয়ের ঝুমরা বা একতাল ব্যবহৃত হতো। বহ্‌লাওয়াতে অনেক মীড় নিয়ে গোয়ালিয়র ঢঙের তান, বোলতান, সরগম--এই রাস্তা পেরিয়ে খাঁ সাহেব দ্রুত খেয়ালে চলে যেতেন--যেখানে ওঁর পাল্টা, দুনি-চৌদুনি তান-এর ধারে কাছে আসা অন্য কোনো শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে খেয়াল ছাড়াও বড়ে গোলামের তূণে ভীষণ মূল্যবান তীরটি ছিলো ঠুংরী ও দাদ্‌রা--যার কথা আগে কিছুটা বলেছি। প্যাঁচালো হরকতে রঙিন ঠুংরীর উৎস কিন্তু এশিয়া ও ইরানের দেহাতী সঙ্গীত। বড়ে গোলামের সুপুত্র মুনববর আলি খাঁও আসামান্য প্রতিভাবান ছিলেন। ওঁর রেওয়াজ ও স্বরপ্রয়োগের পদ্ধতি বড় খাঁ সাহেবের মতোই ছিলো, এছাড়াও মনুববরের তালিম ছিলো আমিনুদ্দিন খাঁর কাকা তানসেন পাণ্ডার কাছে ধ্রুপদের, ফলে তিনি সপ্তকের যে কোনো জায়গায় গলা ছুঁইয়ে গমক করতে ওঁকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। মুনববরের 'বেহাগ' শুনলেই সে কথাই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বড়ে গোলামে রনাতি, অর্থাৎ মুনববর আলির ছেলে রেজা আলিও ইদানীং খুবই ভালো গান করেছেন। যাই হোক বড়ে গোলাম আলির গাওয়া কয়েকটি ঐতিহাসিক খেয়ালের তালিকা এবার দেওয়া যাক---

গুজরী তোড়ি আড়ানা দেশি তোড়ি
ভীমপলশ্রী বেহাগ কেদার
দরবারী কানাড়া পাহাড়ী জয়জয়ন্তী
মালকোষ কামোদ পরজ, ইত্যাদি।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত
(ধ্রুপদ ও ধামার)

এতোক্ষণ আমরা খেয়াল গানের নানা ঘরানা ও তাদের স্বভাবগত প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে খেয়াল ধ্রুপদের তুলনায় নেহাৎই অর্বচীন। ধ্রুপদ ও ধামার ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের প্রাচীনতম ধারা--যা একবিংশ শতাব্দীতে এসে ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। এখন আর সেভাবে ধ্রুপদ-ধামার গাওয়া হয় না, ফলতঃ আগামী দশ বছরের মধ্যেই যদি এই গানের ধারা হারিয়ে যায়, তাহলে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই।

'ধ্রুপদ' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'ধ্রুব' এবং 'পদ' থেকে --যার অর্থ দৃঢ়পদ বা নিয়মনিষ্ঠপংক্তি অথবা ছত্র। সুতরাং ধ্রুপদ গানের সংরক্ষণশীল কড়াকড়ির ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গঠনগগত বিধিবদ্ধতা এবং কাঠিন্য থাকার পাশাপাশি এর ভাবগত ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক দিকটিও জরী। কতোদিন আগে থেকে ধ্রুপদ গাওয়া শু হয়েছে, একথা নিশ্চিত করে বলা খুবই মুশকিল, তবে পঞ্চদশ শতকের শেষ সময় এই গান গীত হওয়ার পরিচয় পাওয়া গেছে। বৈজু বাওরা, মিয়াঁ তানসেন, গোপাল প্রমুখ কিংবদন্তী শিল্পীরা এই গানকে সুসংহত এবং সুগ্রন্থিত করেন। এ বিষয়ে অবশ্য রাজা মানসিংহ (গোয়ালিয়র) এবং স্বামী হরিদাসের নামটিও ভুলে গেলে চলবে না। ধ্রুপদের চারটি গঠনগত অংশের বিভাজন পাওয়া যায়--স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগী। এই প্রত্যেকটি অংশে step by step উন্নীত হতে হয়,--অবশ্যই যথাযথ sequence ধরে রেখে। ধ্রুপদের আলাপে 'নোম্ তোম্' একটি গুত্বপূর্ণ জায়গা দখলকরে। এ ছাড়াও রি,ভা,না,য়ালা,য়ালি,লি ইত্যাদি অর্থহীন styllable ও ব্যবহৃত হয় রাগের ক্রমশঃ বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত উন্মোচনে। বিষয়ের দিক থেকে এই গান সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত। ভগবানের স্তুতি, রাজার জয়গান, প্রকৃতির বর্ণনা ইত্যাদি এই গানের বিষয় হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই এই গানের পরিবেশনে একগাম্ভীর্য এবং আত্মমগ্নতা জরী হয়ে পড়ে। এই জন্যেই বোধহয় মহিলা কণ্ঠে ধ্রুপদ অনুশীলন বড়ো একটা শোনা যায় না।

ধ্রুপদ বাঁধা হয় সাধারণতঃ চৌতালে, সুরফাকতা বা আদিতালে। রাগরূপ অক্ষত রাখার দিকে কড়া নজর দেওয়া হয়--বিশুদ্ধ মতে রাগের রূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে। ভক্তিরসাত্মক ও গম্ভীর প্রকৃতির রাগই বাছা হয়, এবং এই গানে তবলার বদলে থাকে পাখোয়াজ। এই যন্ত্রটি ধ্রুপদ-ধামারের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। শিল্প সুষমার দিক থেকেবিচার করলে এই গানে সাংঘাতিক কড়াকড়ি থাকার দন এর নমনীয়তা বা flexibility নেই বললেই চলে। ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা শিল্পীর স্বতন্ত্র প্রকাশের সুযোগ প্রায় নেই। ধ্রুপদেরই যে অংশ দ্রুত লয়ে (ধামার তালে) গাওয়া হয়, তাকে বলে 'ধামার'। যদি এতে রঙে উৎসব দোলের বর্ণনা থাকে, তাহলে একে বলা হয় 'হোরি'। ধ্রুপদেরকোনো অংশ ঝাঁপতালে বাঁধা হলে তাকে বলা হয় 'সাদরা'। বীণার মতো যন্ত্রসঙ্গীতে ধ্রুপদ পরিবেশন করা যায়। একথা বলাই বাহুল্য যে ধ্রুপদ পরিবেশনে খেয়ালের তান কার এখানে অবশ্য নিষিদ্ধ। ধ্রুপদ গানে যে ঘরানার ধারণা পাওয়া যায় থাকে 'বাণী' বলে সম্বোধন করা হয়। এই বাণী চার ভাগে বিভক্ত 'গোবরহার', 'নৌহার', 'খণ্ডহর' এবং 'ডাগর' এবং বাণী। এই বাণীগুলি থেকে প্রভাবিত হয়ে পরতবর্তীকালে খেয়ালের বিভিন্ন ঘরানা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, ডাগরবাণী জন্ম দিয়েছে জয়পুর ঘরানার, নৌহার বাণী জন্ম দিয়েছে আগ্রা ঘরানার। ডাগর পরিবারের দুটি প্রবাদ পুষের নাম পাওয়া যায়--আল্লাবন্দে খাঁ ডাগর এবং জাকিদ্দিন খাঁ ডাগর। এঁদেরই চার পুত্র হলেন--নাসিদ্দিন খাঁ ডাগর, রিয়াজুদ্দিন খাঁ ডাগর, রহিমুদ্দিন খাঁ ডাগর এবং হুসেনুদ্দিন খাঁ ডাগর। এঁদের মধ্যে ডাগর পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক হিসাবে আবার নাসিদ্দিন খাঁ ডাগরের নামই করা হয়। এঁদের পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীরা হলেন--নাসির আমিনুদ্দিন ডাগর, নাসির মহিউদ্দিন ডাগর, জাহিদ্দিন ডাগর এবং ফৈয়াজুদ্দিন ডাগর। ডাগরদের পরিবারে যুগলবন্দী গানের চল সবচেয়ে বেশি। আমিনুদ্দিন - মহিউদ্দিনের যুগলবন্দী অথবা তারও পরে জাহিদ্দিন-ফৈয়াজুদ্দিনের যুগলবন্দী ধ্রুপদ গানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ১৯-এরও অধিক প্রজন্ম এই পরিবারে রাজত্ব করে গেছে --এই ধ্রুপদ - ধামারের ইতিহাসে। এখনো এই পরিবারের লোকজনের আগ্রহে জয়পুর, দিল্লী এমনকী সূদুর প্যারিস শহরে ধ্রুপদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

* নাসির আমিনুদ্দিন ডাগর ও মহিউদ্দিন ডাগরের যে কয়েকটি ধ্রুপদের রেকর্ড পাওয়া যায়, তা হলো-
ভৈরব আড়ানা

ভৈরব হোরি মিয়াঁ মল্লার
দরবারী কানাড়া
* জাহিদ্দিন ডাগর ও ফৈয়াজুদ্দিন ডাগরের যুগলবন্দীতে পাওয়া যায়--
মিয়াঁ মল্লার জয়জয়ন্তী
* রহিমুদ্দিন খাঁ ডাগরের কণ্ঠে ধ্রুপদ --কেদারা রাগেশ্রী কানাড়া
ডাগার ভাইরা ছাড়াও আরও যে সমস্ত শিল্পীরা ধ্রুপদ গান গেয়েছেন--তাঁদের মদ্যে উল্লেখযোগ্য
ফৈয়াজ খাঁ (ডাংখর, দেশ) বিলায়েৎ হুসেন খাঁ
খাদিম হুসেন খাঁ অন্যান্য আগ্রার কয়েকজন শিল্পী।
* বিহারের দারভাঙার--রামচতুর মালিক এবং সিয়ারাম তিওয়ারী।
* লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌবে এবং বালজী চতুর্বেদী।
* শিবকুমার মিত্র * ভরত ব্যাস।
* আগ্রার রতনজনকরজীর ছাত্ররা--
এস. সি. আর ভাট্, কে. জি. গিন্দে এবং দিনকর কৈকিনী
* 'বিষ্ণুপুর' ঘরানার-- গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠুংরী ও টপ্পা
(লঘু শাস্ত্রীয় সংগীত)

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে ঠুংরী, টপ্পা, ভজন, গজল ইত্যাদি গানকে 'লঘুশাস্ত্রীয়' (light classical) বা 'উপ শস্ত্রয়' সঙ্গীত আখ্যা দেওয়ার আমি বিরোধী। যদি কেউ মনে করে থাকেন যে তথাকথিত 'শাস্ত্রীয়' সঙ্গীতের তুলনায়এই গানগুলি গাওয়া অধিকতর সহজ, অথবা এই 'লঘুশাস্ত্রীয়' গানেরত্রন্দ্বব্দ্ধড়ন্দ্বব্ধনন্ত মূল্য অনেক কম--তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। ফৈয়াজ খাঁ যে ঠুংরী গাইতেন. তারও আগে মৌজুদ্দিন যা গাইতেন, ফৈয়াজের সমসাময়িক আবদুলকরিম খাঁ যে ঠুংরী গেয়েছেন, পরবর্তীকালে বড়ে গোলাম, বরকত আলি খাঁ, হীরাবাই বরোদেকর, সুরেশবাবু মামে যে ঠুংরী গেয়েছেন --তা কি inferior Art -এর পর্যায়ভুক্ত ? সবশেষে আখ্তারী বাই, রসুলন বাই, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, বড়ি মোতি বাই, জানকিবাই --এঁদের ঠুংরী-দাদ্রা কি অতো সহজেই গাওয়া যায় ? তাহলে ঠুংরীকে আমরা 'লঘুশাস্ত্রীয়' গান বলবো কেন ? টপ্পার কথা আসা যাক্। শোরী মিজ্ঞা প্রচলিত টপ্পা--যা পঞ্জাবী টপ্পা নামে সমধিক পরিচিত--তাতে মুশ্তাক হুসেন খাঁ, কঞ্চরাও শঙ্কর পণ্ডিত (কাফি) অথবা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর 'আড়ানা বাহার' -এ যে রসের আস্বাদন আমরা করি--তা কি কোনো অংশে কম শাস্ত্রসম্মত ? ভজন গানে ওঙ্কারনাথ, বড়ে গোলামের পুরোপুরিclassical পরিবেশনা, গজলে মেহ্দী হাসানের রাগদারী পেশ্কর--এই গানের 'লঘুশাস্ত্রীয়' তক্মার কতোটা যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করে ? আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগে এই কোলকাতার শ্রীদিলীপকুমার রায় 'অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে' 'শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ঠুংরী গানের ভবিষ্যত' --এর ওপরে একটি লিখিত বক্তৃত রেখেছিলেন। তাতে তিনি দাবী করেছিলেন যে, ঠুংরীকে খেয়াল ও ধ্রুপদের মতোই সমান সম্মান দিতে হবে যেহেতু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মূল্য আছে। এতে গায়কের হৃদয়ের আবেগ এবং গায়কীর সৌন্দর্যের অকুণ্ঠ প্রকাশ হয়, যা ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের আঙ্গিকে অতি উঁচু দরের শিল্পীর চেষ্টা ছাড়া বিশেষ ফুটে ওঠে না।

'ঠুংরী' শব্দটি এসেছে হিন্দী ত্রিয়াপত 'ঠুমক্না' থেকে, যাক অর্থ--পা ফেলে একপ্রাকর নাচার মধ্যে হাঁটা -যাতে গোড়ালি দুটিও নাচতে থাকে। এখান থেকেই বোঝা যায়--ঠুংরী গানের সঙ্গে নাচের মুলগত একটা সম্পর্ক রয়ে গেছে। নৃত্যশিল্পই শুধু নয়, ঠুংরীর সঙ্গে জড়িত নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি, শৃঙ্গাররস, উত্তেজক প্রেমের কবিতা এবং উত্তপ্রদেশের লোকগগীতি। ঠুংরী গানের জনপ্রিয়তা এবং বিস্তৃতির মূলে রয়েছে লক্ষ্ণৌয়ের ওয়াহিদ আলি শাহ্-এর উৎসাহ ও উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা। ঠুংরী সাধারণত দীপচাঁদি, রূপক, আধ্যা ইত্যাদি তালে বাঁধা হয়। অর্থাৎ খেয়াল বা ধ্রুপদে ব্যবহৃত তাল থেকে একেবারেই আলাদা। সাধারণত হালকা ধরণের শৃঙ্গার রসাত্মক feminine রাগকেই ঠুংরী গানের রচনার জন্য উপযুক্ত হিসাবে বাছা হয়, যেমন--পিলু, ভৈরবী, কাফি, খামাজ, যোগিয়া এবং পাহাড়ী বেশিরভাগ ঠুংরীই অবশ্য মিশ্ররাগিণীতে বাঁধা হয়, ফলে বিশুদ্ধ রাগরূপ বজায় রাখার জন্য কোনো বিধিবদ্ধতা থাকে না--শিল্পীরা নিজেদের মনের মাধুরী ও রং মিশিয়ে পরিবেশন করে থাকেন। বোল বাঁট, বাল বানাও-এর সঙ্গে সঙ্গে কথকের কিছু অঙ্গও এই গানে ব্যবহার করা হয়। সবশেষে লয় বাড়িয়ে তবলচিকে 'লগ্গি' -র ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হয় (এও কত্থক নৃত্যেরই অঙ্গ), দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক সময় শিল্পী দুগুণে পৌঁছে আবার পুনরায় প্রাথমিক লয়ে ফিরে আসেন। ধ্রুপদের সঙ্গে যেমন ধামার গাইতে হয়,--তেমনি ঠুংরীর সঙ্গে একই আসরে দাদ্রা গাইতে হয়--এমন নিয়ম আছে। দাদ্রা (ছ'মাত্রার দাদ্রা তালে নিবদ্ধ) গানেও ঠুংরীর মতো প্রেম, বিরহ, পুনর্মিলন-এর ছবি আঁকা হয়। বৃষ্টি ভেজা রাতে, অথবা নীল আকাশের নীচে, বা দুলতে থাকা 'ঝুলা'য় নায়ক -নায়িকার আবার দেখা হচ্ছে --এমন একটা ছবি ফুটে ওঠে এই ঠুংরী - দাদরায়।

ঠুংরী-র কয়েকটি প্রধান ঘরানা
বেনারস ঘরানা---
বেনারস ঘরানায় বোল বানাও ঠুংরী বেশি শোনা যায়। এই ধরণের ঠুংরীতে গানের কথাগুলিকে অর্থযুক্ত ভাবে যন্ত্রসঙ্গীতের বিশেষত সারেঙ্গীর সহযোগিতায়, উচ্চারণ করা হয়। উত্তর প্রদেশের নানা লোকসঙ্গীত এই ঘরানার ঠুংরী গানকে সমৃদ্ধ করেছে। বেনারস ঘরানার ঠুংরীতে লয় বাড়িয়ে 'লগ্গি'-র ব্যবহার আবশ্যিক। তবে সাধারণত এই ঘরানার ঠুংরী, অন্যান্য ঘরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত মন্দ লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। লক্ষ্ণৌ ঘরানার লাস্য সম্বলিত 'অভিনয়'-এর বিপরীতে এই ঘরানার ঠুংরীতে অধিকতর seriousness লক্ষিত হয়। এই ঘরানার কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী এবং তাঁদের কয়েকটি বিখ্যাত গান হলো---

*সিদ্ধেশ্বরী দেবী
"জাও বহীঁ তুম শ্যাম " (ঠুংরী খামাজ)
"পানি ভরে রি কৌন" (দাদ্রা)
"সব সুধি আবে হো রামা" (কাজরী)

"ও মিয়াঁ ম্যায়ঁ তন্দে বরী জাউঁ" (টপ্পা)
"উদত আবীর গুলাল" (হোরি)
"মুরালিয়া কৌন গুমন বারী" (ঠুংরী)
"সাওঁরিয়া প্যার রে মোরি গুইয়াঁ" (দাদ্‌রা)
"রসকে ভরে তোরে ন্যায়েন" (ভৈরবী ঠুংরী)

*রসুল বাই
"পনঘটবা না জাওজী" (পূর্বী দাদরা)
"কঙ্কর মোহে লাগ" (কাজরী)
"লাগত কলেজবা মে চোট" (ভৈরবী ঠুংরী)
"তরসত জিয়া হমাব" (কাজরী)
"যা ম্যাঁয় তোসে না বলু" (ভৈরবী ঠুংরী)
"অঙ্গন মেঁ মৎ সো" (ঠুংরী)

*বড়ি মোতি বাই
"পানি ভরে রে কৌন আলবেলী নার" (দাদ্‌রা)
"কান্‌হা বিখ্‌ ভারী বনসিয়া" (পূর্বী ঠুংরী)
"তুহি বতা দো জগ্‌ মেঁ জওয়ান" (কাজরী)

লক্ষ্ণৌ ঘরানা
লক্ষ্ণৌ- এই ঠুংরীর জন্ম হয়, সুতরাং এই ঘরে গীত ঠুংরী স্বভাবতই সূক্ষ্ম এবং অপেক্ষাকৃত জটিল। রাজদরবারে নৃত্য পরিবেশনের সঙ্গে এই ঘরানার সম্পর্ক থাকায় এই ঘরে ঠুংরীতে অঙ্গভঙ্গী, অভিনয় ইত্যাদি এসে পড়ে। এই ঘরানায় গাওয়া ঠুংরীর কাব্যে লাস্যরসের অধিক উপবেশন। এই ঘরের একটি বড়ো অবদান হলো--- 'বন্দিশ কি ঠুংরী'র প্রচলন। এই সমস্ত গান সাধারণত দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়, এবং নাচের উপযোগী করে গাওয়া হয়। এই সমস্ত গানের বন্দিশ এতোই আকর্ষণীয় যে অনেক সময়ে বিখ্যাত খেয়ালিয়ারাও একে ছোটো খেয়াল হিসেবে গেয়েছেন। লক্ষ্ণৌ ঘরানার সবচেয়ে বড়ো ঠুংরী - দাদ্‌রা গাইয়ের নাম বেগম আখতার (পূর্ব জীবনে আখ্‌তারী বাই), যিনি গজল গায়নেও খ্যাতির শিখরে উঠেছিলেন। ওঁর গাওয়া কয়েকটি জনপ্রিয় ঠুংরী ও দাদরা হলো--
* বেগম আখতার
"পিয়া মিলন হম জায়ে" (মিশ্র পিলু ঠুংরী)
"না জা বালমা পরদেশ" (মাঞ্জ খামাজ ঠুংরী)
"তুমি জায়ো মোসে না বোলো" (খামাজ দাতরা)
"কোয়েলিয়া মত্‌ কর পুকার" (খামাজ ঠুংরী)
"ছা রহী কালী ঘটা" (দেশ দাদ্‌রা)
"হম পছু তায়ে সাজনা" (দেশ ঠুংরী)
"যব সে শ্যাম সিধারে" (কাফি ঠুংরী)।
পাতিয়ালা ঘরানা
পাতিয়ালা ঘরানর উৎপত্তি হয়ে অনেক পরে। এই ঘরের প্রায় সমস্ত ঠুংরীই টপ্পা অঙ্গে গাওয়া হয়। বেনারসের খেয়াল- - নির্ভর ঠুংরী বা লক্ষ্ণৌয়ের নৃত্য-উপযোগী ঠুংরী এই ঘরে অনুপস্থিত। এই ঘরের ঠুংরী নিজস্ব কল্পনা বিলাসিতাদিকে বেশি জোর দেয় এবং অত্যন্ত speed -এর সাধারণ এর চলন শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখে। মূলতঃ কাফি, পাহাড়ী, কালিংগ্রা পিলু--ইত্যাদি রাগেই ঠুংরীগুলো বাঁধা হয়। পাহাড়ী রাগটিকে জনপ্রিয় করার মূলে কিন্তু আছে এইঘরানাই। বড়ে গোলাম থেকে শু করে সলামৎ --নজামৎ, এমনকী মহঃ রজ্জাক খাঁ পর্যন্ত 'পাহাড়ী'তে ঠুংরী গেয়েছেন। পাতিয়ালা - ঠুংরী যেহেতু শোরী মিক্স্রা প্রনীত পঞ্জাবী টপ্পার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে, তাই এর চলনেরসাথে উটের চলন এবং আওয়াজের মিল আছে। এই বস্তু 'স্বপ্নন্দপ্ত ব্দস্কন্ধ' নামক একপ্রকার মভূমির লোকগানের থেকে সৃষ্টি। তবে এই ঘরানার ঠুংরী দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে কখনো কখনো অক্ষম হয়ে পড়ে --বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ভালো লাগাগুলো আসে--স্ফুলিঙ্গ দিয়ে উঠে নাড়াচাড়া করে --আবার চলে যায় একই ছন্দে। এই কথাটি অবশ্য বড়ে গোলাম আলি খাঁর ঠুংরীর ক্ষেত্রে খাটে না। কোনোঠাহ্‌রান না থাকা সত্ত্বেও মুড়কি ও হরকতে ভারাক্রান্ত হয়েও খাঁ সাহেবের প্রতিটি ঠুঁরী ও দাদারা এক-একটি ঐতিহাসিক সৃষ্টি। বড়ে গোলামের ভাই বরকত আলি খাঁও অসম্ভব ভালো ঠুংরী গাইতেন--অনেক বেশি ঠাহ্‌রান নিয়ে--শব্দ ও স্বরের মায়াজাল ছড়িয়ে।

বড়ে গোলাম আলি খাঁ
"প্রেম অঙ্গন জিয়ারা"
"কঙ্কর মারা জাগায়ে"
"সাঁইয়া বোলো"
"আয়ে ন বালম" ...ইত্যাদি।

বরকত আলি খাঁ
"মোরা সাঁইয়া তনক দিই লায়ে"
"তুম রাধে বানো শ্যাম"

"যাও কদর নহী বোলো"
"অব ন মানুঁ তোরি বাতিয়া"।

এই ঘরানা বদ্ধ ঠুংরী গানের আওতার বাইরেও অনেক শিল্পী -- যাঁরা ধ্রুপদ খেয়ালে তালিম পেয়েছিলেন--তাঁরা মনের আনন্দে ঠুংরী গাইতেন। এঁদের মধ্যে পাই খেয়ালিয়া হিসাবে দিকপাল কিছু শিল্পীকে---যেমন, ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ-- আবদুল করিমের ছেলে সুরেশ বাবু মানে, মেয়ে হীরাবাই বরোদেকর এবং পরবর্তী সময়ে 'কিরানা'রই ভীমসেন যোশী। দুজন প্রখ্যাত খেয়ালিয়া--আমার ভীষণ পছন্দের আমীর খাঁ এবং মল্লিকার্জুন মনসুর কখনও ঠুংরী গাননি। অথচ এঁদের গলায় ঠুংরী গান যে কী উচ্চতা পেতে পারতো--তা ভেবে এঁদের শ্রোতারা নিশ্চয়ই আফশোস করবেন। এঁদের কথা যথাস্থানে বলেছি, তবু এঁদের গাওয়া কয়েকখানি কালজয়ী ঠুংরী ও দাদার গানের তালিকা এখানে প্রকাশ করা হলো---
ভৈয়াজ খাঁ
"বাজু বন্দ্ খুল খুল যায়ে" (ভৈরবী ঠুংরী)
"মোরে যোবনা পে পার আই" (তিলক কামোদ দাদ্রা)
"কাঁহে কো ঝুটি ন বনাও বতিয়া" (ভৈরব দাদ্রা)
আবদুল করিম খাঁ
"সাজন তুম কাহে কো নেহা" (তিলং ঠুংরী)
"জাদু ভরেলি কৌন" (গারা ঠুংরী)
"যমুনা কে তীর" (ভৈরবী ঠুংরী)
"পিয়া মিলন কি আস" (যোগিয়া ঠুংরী)
"পিয়া বিন নহী আবত চৈন" (বিঝোঁটি ঠুংরী)।
হীরাবাই বরোদেকর
"অকেলি ডর লাগে" (তিলক কামোদ ঠুংরী)
"সুন্দর স্বরূপ জাকে" (ভৈরবী ঠুংরী)
"কাসেঁ সতাও মোহে শ্যাম" (ঠুংরী)
"অব্ কে সাওন ঘর আজা" (দেস ঠুংরী)
"লাগি মোরি বিন্দিয়া" (ভৈরবী ঠুংরী)
"কাহেঁ পিয়া বিন চৈন" (ঠুংরী)

বাঙালী নিধুবাবুর টপ্পা শুনতে অভ্যস্ত। তবে টপ্পার জন্ম হয় পঞ্জাবের উট চালকদের হাতে। পঞ্জাবি ও পুশ্তু ভাষায় কিছু কিছু গান ওদের মধ্যে প্রচলিতে ছিলো। তা-ই গ্রহণ করেন শোরী মিয়াঁ এবং পঞ্জবী টপ্পা হিসাবে সে গান পরবর্তীকালে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়। টপ্পায় জমজমা, গিট্কিরি, খট্কা এবং মুড়কির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।এই এতো অবধি এসে আমরা আমাদের কণ্ঠ সঙ্গীতের আলোচনা শেষ করবো। আমরা খেয়াল, ধ্রুপদ-ধামার, ঠুংরী - দাদ্রা ও টপ্পা নিয়ে এতে াক্ষণ আলোচনা করলাম। এবারে আমরা যাবো বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস -- তাদের ঘরানা ও শিল্পীদের দিকে।

শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীত
ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে কণ্ঠসঙ্গীতের পাশাপাশি যন্ত্রসঙ্গীতও সমান গুত্ব পেয়ে থাকে--কখনো তা বেশি বই কম নয়। প্রথম যারা এই ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনতে চলেছে -- তাদের কাছে অনেক সময়েই যন্ত্রসঙ্গীত অনেক বেশি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। তার কারণ বোধহয় একটা আছে। কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কারোর কারোর গলা অত্যন্ত সুরেলা ও মিষ্টি -- যেমন, আবদুল করিম, হীরাবাই, আমীর খাঁ, পালুস্কর, কুমার গন্ধর্ব, বড়ে গোলাম, মল্লিকার্জুন, ---এঁদের সকলেরই কণ্ঠের নিজস্ব জ াদুতে যে কোনো সময়ে যে কোনো শ্রোতাই সম্মোহিত হয়ে যাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্ত কণ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীর গলাই প্রথম শ্রবণে যে সমান আকর্ষণীয় হবে--এমনটা নয়। অনেক তাবড়তাবড় শিল্পীকেই শুনেছি, যাদের অধিকাংশেরই গলা ঘসা তামার মতো, বা অস্বাভাবিক কর্কশ কিংবা বীভৎস গম্ভীর--বারবার শুনলে তঁ াদের আত্মীকৃত করা সম্ভব, হয়তো তবে ওই কথায় আছে না first impression is the best impression ! এরকম অনেক সময়েই হয় যে, প্রথমবার শুনে অমুক শিল্পীর গলা ভালো লাগলো না--ব্যাস্ অমনি দুম্ করে তাঁকে বাতিল করে দিলাম। এই প্রবণতাকে আমি প্রশ্রয় দিচ্ছিনা মোটেই--কারণ রচন ার প্রথমেই বলে রেখেছি যে 'গীতসুত্রসার' গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই স্টেট্মেন্টটা অর্থাৎ,"অনেক না শুনিলে মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম হয় না" -কেই আমি আমার উপজীব্য বিষয়বস্তুর সারমর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছি। তবে এই যে সাধারণ শ্রোতার প্রবণতার কথা বললাম--তা কিন্তু অনেকাংশেই দেখা যায় না যন্ত্রসঙ্গীত শোনার ক্ষেত্রে। কারণটা খুবই সহজ--কে বাজাচ্ছে, কেমন বাজাচ্ছে--তা নির্বিশেষেই অধিকাংশ বাদ্যযন্ত্রেরই একটা মিষ্টত্ব এবং নিজস্ব melody আছে--সুরের ভক্তমাত্রেই সে রসে নিমজ্জিত হবেন। অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র, যেমন সেতার, সরোদ, বেহালা, সারেঙ্গী, বাঁশি, সানাই--এদের সবারই নিজস্ব কিছু আপাত সহজবোধ্য আবেদন আছে --যা কোনো নতুন শ্রোতাকে খুব সহজেই কণ্ঠসঙ্গীতের থেকে যন্ত্রসঙ্গীত শোনার দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়তে মদত দিতে পারে। এ হেন উস্ক ানির পরিণাম ভালো না মন্দ--সে বিচারে না গিয়ে আমরা এবার সরাসরি ঢুকে পড়ি শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতের আলোচনার ভেতরে।
ভারতীয় সঙ্গীতের যন্ত্রগুলিকে তাদের প্রধান এবং সক্রিয় শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গের বিচারে মূলতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে--(১) তার যন্ত্র (string instrument), (২) বায়ু যন্ত্র (wind instrument), (৩) ঘন বা (solid-bodied instrument), এবং (৪) পর্দা লাগানো যন্ত্র (membrane-covered instrument). এছাড়াও কিছু কিছু উপবিভাজনও আছে--তবে সেগুলি অনেক সময়েই মানা হয় না। এই চারটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম দুটিকে অ-সুরেলা যন্ত্র বা mon-moelodic instrument এইভাবেও ভাগ করতে চান--তবে এই বিভাজন নিয়েও তর্কের অবকাশ থেকেই যায়। মোটামুটি যে ক'টি স্বীকৃত যন্ত্রকে এই চারটি শ্রেণীর অন্তভুক্ত করা হয়, সেগুলি হলো---
(১) তার যন্ত্র--
ক) সারেঙ্গী, বেহালা, দিলবা, এস্রাজ, তারসানাই।

খ) সেতার, বীণা, সরোদ, সন্তুর।
(২) বায়ুযন্ত্র--
ক) সানাই, বাঁশি, ক্ল্যারিওনেট্, হারমোনিয়াম।

এই যন্ত্রগুলি মধ্যে প্রধান কয়েকটি ওপরেই এবার আমাদের আলোচনা হবে এবং এই আলোচনা যথাসম্ভব ঘরানা-ভিত্তিক হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। যন্ত্রসঙ্গীতের শ্রেণীবিভাগের non melodic বা 'অ-সুরেলা যন্ত্র' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যন্ত্রগুলি, যেমন তবলা পাখোয়াজের কথা সবিস্থারে আলোচনা করা এখানে সম্ভব হলো না। তার ও বায়ু যন্ত্রের মধ্যে সারেঙ্গী, বেহালা, এস্রাজ, সানাই ও বাঁশি কণ্ঠসঙ্গীতের অনেকটাই কাছাকাঠি, কারণ এগুলি সবই একধরণের টানা-টানা, uninterrupted সুর সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন, ছড় দিয়ে টেনে-টেনে সারেঙ্গিতে, বা বাতাসে ফুঁ দিয়ে বাঁশিতে--প্রায় অবিচ্ছেদ্য সুরেলা জাল বোনা হয়। অপরপক্ষে, সেতার,সরোদ ও বীণাকে plucking instrument বলা হয়, কারণ এতে তার 'স্বপ্তুত্তন্তুন্স' করা হয়, এবং সন্তুরে তার আঘাত করা হয় বা strike করা হয়--বাঁকানো দুটি কাঠির সাহায্যে। এই ঘটনাটিই কণ্ঠসঙ্গীতের সমগোত্রীয় সুর সৃষ্টিতে সারেঙ্গী, বেহালা, এস্রাজ, সানাই ও বাঁশির আওয়াজকেসেতার, বীণা, সারোদের আওয়াজ থেকে আলাদা করে রেখেছে। সেতার বা সরোদে নিশ্চয়ই গায়কী অঙ্গ বাজানো য়ায়--এবং বিলায়েৎ ও আমজাদের মতো শিল্পীরা বাজিয়ে থাকেনও --কিন্তু এই যন্ত্রগুলি সবসময়ই কণ্ঠসঙ্গীতের আওয়াজকে নকল (কপি) করতে সচেষ্ট থাকে না, যে প্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সারেঙ্গী, বেহালা বা বাঁশির ক্ষেত্রে। এই শেষোক্ত তিনটি যন্ত্রের শিল্পীরা অনেক সময়ই কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীরা যে সব 'চীজ্' ব্যবহার করেন, তা হুবহু ব্যবহার করতে পেরে গর্ব বোধ করেন--ফলে যা হয় তা-ই হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠশিল্পীদের ছায়ার তলাতেই রয়ে গেছে। এ কথা হয়তো পুরোপুরি খাটে না সেতার ও সারোদের ক্ষেত্রে--কারণ মনোযোগী শ্রোতামাত্রেই এই দুটি যন্ত্রের স্বতন্ত্র expression, language ও ভাবে কথাটি বুঝতে পারবেন। সেতার ও সরোদ ধীরে ধীরে নিজস্ব vocabulary ও idiom গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। কয়েকজন বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পী এই ব্যাপারে তাঁদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন যে তাঁদের বাজনা শুধুমাত্র কণ্ঠসঙ্গীতেরই প্রতিরূপ নয়--তার চেয়ে আলাদা বা তার চেয়েও বেশি কিছু। এই ব্যাপারে আলি আকবর ও রবিশংকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন আছে। মেলোডির দিক থেকে রাগের প্যাটার্ন ও লয়ের দিক থেকে তালের লজিক্ অনুসরণ করা হলেও এ সব যন্ত্র যে কণ্ঠসঙ্গীতের সমান গুত্ব দাবী করতেই পারে--তা নতুন আলোতে দেখার সময় বোধহয় এবার এসে গেছে। সেতার, সরোদ, বীণা, বাঁশি, সারেঙ্গী, বেহালা--এই যন্ত্রগুলির মধ্যে একমাত্র সেতার সম্পর্কেই একটি যথাসম্ভব সংক্ষেপিত ঘরানা ও ইতিহাস কেন্দ্রিক আলোচনা দেওয়া সম্ভব হলো এবং আমাদের এই সামগ্রিক আলোচনা থেকে দিলবা, তার সানাই, ক্ল্যারিওনেট্ ও হারমোনিয়ামের নাম বাদ দেওয়া হলো। ওপরের বক্তব্যগুলি বুঝতে পারলে কারণটা অনুধাবন করতে অসুবিধা না হওয়াই উচিত।

সেতার

মূলতঃ দু'ধরণের গৎ-রচনা সেতারে শোনা যায়--মসিদ্খানি ওরাজখানি। রাগ বিস্তারের ক্ষেত্রে ছোটো খেয়াল ও বড়ো খেয়ালের পরিবেশনের ভিত্তিতেই এই বিভাজন। তবে সে কথায় যাওয়ার আগে একটা কথা স্বীকার করে নেওয়াভালো, যা আগে বলতে আমি ভুলে গেছি, তা হলো--সরোদ বা সেতার --বীণা তো বটেই, ভীষণভাবে ধ্রুপদের approach কে অনুসরণ করে, বিশেষ করে আলাপ অংশে প্রকৃত রাগরূপ উন্মোচনে। বিলম্বিত লয়ে বাঁধা গৎটিকে বলা হয় মসিদ্খানি গৎ এবং দ্রুত লয়ে বাঁধা গৎটিকে বলে রাজাখানি গৎ। এই দুই ভিন্ন গৎ সম্পর্কে এবার কিছু কথাবলে নেওয়া যাক। বিলম্বিত লয়ে পরিবেশিত মসিদ্খানি গতে খেয়ালের মতো যথেষ্ট improvisation -এর সুযোগ থাকে।পরবর্তীকালে সুরের continuity আরো মজবুত করতে বাড়তি তিন থেকে পাঁচটি তারের সংযোজনা করা হয় সেতার যন্ত্রটিতে-ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেতারের tonal range অনেকটাই বেড়ে যায়। এই মসিদ্খনি গতে 'আলাপ'-এর পরপরই 'মুখ্ড়া' এসে পড়ে এবং সাধারণত তিনতালে নিবদ্ধ এক দুই লাইনের 'স্থায়ী' ও থাকে। সবশেষে খেয়াল অঙ্গের মতোই 'অন্তরা' বাজনো হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ের দ্রুত লয়ে বাঁধা গৎটিকেই বলে রাজাখানি গৎ।এই গৎের তাল সাধারণত পূর্ববর্তী মসিদ্খানি গাতের তাল থেকে আলাদা হয়। রাজাখানি গতের আসল রূপরস কিন্তলুকিয়ে থাক এর 'তিহাই' ও 'তান'বাজির ভেতরেই। এই গতে 'তোড়া' এবং 'ঝালা'ও গুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে--যার সাথে ছোটো খেয়ালের সাদৃশ্য খুবই বেশি। এই রাজাখানি গৎটিকে 'দুগুনি' গৎ নামেও ডাকা হয়।

ভারতীয় রাগসঙ্গীতের সবচেয়ে জনপ্রিয় যন্ত্র যদি কিছু থাকে তবে তা অবশ্যই সেতার। ভারতের তো বটেই, বিদেশেও এই যন্ত্র সমধিক জনপ্রিয়। এই যন্ত্রের প্রকৃত ইতিহাস-নির্ভর তথা ঘরানা-ভিত্তিক আলোচনা করা গবেষকের কাজ। ডঃ প্রেমলতা শর্মার থিসিস্ পেপার যদি সত্যিই হয় তাহলে এই যন্ত্র প্রথম অবতীর্ণ হয় দিল্লীতে প্রায় ১৭৪০ সালনাগাদ। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সেতারের ঐতিহাসিক বিবর্তনের রূপরেখা নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব কাজ। অবশ্যই আমি সেদিকে যাবো না। তবে মোটামুটিভাবে কতগুলো গ্রহণযোগ্য তথ্য এখানে দেওয়া যেতে পারে। কিংবদন্তী শিল্পী তানসেন দিল্লীতে ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনখানি 'সেনিয়া' ঘরানা প্রবর্তন করেন। এই ঘরানার শিল্পীরা মূলতঃ ধ্রুপদ ও বীণার চর্চা করতেন। তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাসখানের অনুগামীদের বলা হতো 'গোবরহার বাণী', তান্তারঙ্গের অনুগামীদের বলা হতো 'ডাগরবাণী' এবং তানসেনের জামাই নওবত্খানের অনুগামীরা পরিচিত ছিলেন 'খণ্ডহর বাণী' হিসাবে। এ কথাও শোনা যায় যে দিল্লীর মসনদের পতনের পর তান্তরঙ্গের 'ডাগরবাণী'র অন্তর্গত শিল্পীরা জয়পুরে চলে যান, এবং বিলাসখানের 'গোবরহার বাণী'র শিল্পীরা লক্ষৌ-এ ও নওবত্খানের 'খণ্ডহর বাণী'র অনুগামীরা বেনারসে পাড়ি দেন। তবে এই প্রতিটি ঘরানঅ মিয়াঁ তানসেনের উত্তরাধিকার দাবী করে থাকে। জয়পুরের 'সেনিয়া' বংশকে আবার পাশ্চাত্য (western) এবং লক্ষৌ ও বেনারসের 'সেনিয়া' বংশকে একত্রে প্রাচ্য (eastern) ঘরানা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই শেষোক্ত ঘরানা দুটি পরবর্তীকালে রামপুরের দরবারে আশ্রয় এবং যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা পায়--যাকে আমরা বাবা আলাউদ্দিন খাঁর বংশ বলে পরে জেনেছি।

আমরা সেতারের কথা বলছি বটে, তরে তানসেনের পরবর্তী যুগে যন্ত্র সঙ্গীত বলতে দুটিই মাত্র যন্ত্রকে বোঝাতো --এক, রবার্ ও দুই, বীণা। সেই সময় কণ্ঠসঙ্গীতেও ধ্রুপদ ছাড়া অন্য কিছুর চল ছিলো না। রবাব যন্ত্রটি ছিলো ভীষণছন্দ ও লয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং বীণা ছিলো পুরোপুরি melody বা সুরের ওপর নির্ভরশীল। অনেক পরে, বীণকারদের, অর্থাৎ বীণবাদকদের হাত ধরে সেতার এলো এবং সেই সঙ্গে সেতারিয়ারা 'সুরবাহার' নামক যন্ত্রটিরও ব্যবহার শু করলেন। সুরবাহরের আওয়াজ তুলনামুলকভাবে গম্ভীর এবং এটি বিলম্বিত রাগবিস্তারে ব্যবহৃত হয়, যেখানে দ্রুত গতির চালে সেতার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেতারের মূল যন্ত্রটিতেও পরবর্তীকালে অনেক পরিবর্তন আনা হয়--গঠনগত কিছু হেরফের বা সংযোজনে আওয়াজও পাল্টে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। এত অব্দি এসে

এবার সেতারের মূল তিনটি ঘরানার দিকে একটু দেখা যাক।

১. জয়পুর ঘরানা

আগেই বলেছি যে এই ঘরানার শিল্পীরা নিজেদের তানসেনের ছেলে তান্‌তারঙ্গের বংশধর বলে দাবী করেন। এই ঘরানার পুরনো শিল্পীরা সবাই জয়পুরের বীণকারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছিলো। এই ঘরের শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নামটি হলো ওস্তাদ মসিদ্‌ খাঁ--যিনি সারা ভারতজুড়ে একজন ধ্রুপদীয় হিসেবে, রবাবিয়া হিসাবে, দ্র বীণার দক্ষ শিল্পী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। এই ঘরানার বাদনরীতিকে 'দো হাত কা বাজ'নামে ডাকা হয়--কারণ এতে ডান হাতের plucking এর পাশাপাশি বাঁ হাতের fingering কেও সমান গুত্ব দেওয়া হয়। তালবাদ্যের সঙ্গতে বিস্তার শু হলে এই ঘরের শিল্পীরা ছোটো ছোটো তানের passage-এর খেলা দেখাতে পছন্দ করেন বেশি। মসিদ্‌খানি রচনা শেষ করে এই ঘরের শিল্পীরা মধ্যলয়ে গৎ বাজানোর দিকে হাত বাড়ান।

২. মাইহার ঘরানা

'মাইহার ঘরানা' অধিকতর জনপ্রিয় নাম হলেও এই ঘরানার প্রকৃত নাম 'রামপুর ঘরানা' এই ঘরানার শিল্পীরা অবশ্য খেয়াল গানের ধারাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। রাগ বিস্তারে ধ্রুপদকে প্রামাণ্য হিসাবে মেনে চলতে এই ঘরানার শিল্পীদের ততোটা শোনা যায় না--যদিও বীণাবাদনের approach কেই এই ঘরানা গ্রহণ করেছে। যে বিশেষ দিকটি এই ঘরানাকে সেতারের অন্যান্য ঘরানা থেকে সামান্য হলেও পৃথক্‌ করে রেখেছে তা হলো, এই ঘরের অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ এবং methodical approach. এই ঘরানার জনক হিসেবে বাবা আলাউদ্দিন খাঁর নাম আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। সর্বযন্ত্রবিশারদ এই কিংবদন্তী শিল্পীর কাছেই তালিম পেয়েছিলেন সেতার রবিশংকর এবং সরোদ আলি আকবর খাঁ --যে দুজন শিল্পী বর্তমানের যন্ত্রবাদনকে নির্ধারিত এবং প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বলা চলে। মাইহার ঘরানার সেতারিয়াদের মধ্যে পণ্ডিত রবিশংকর ছাড়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম অবৎশ্যই তিমিরবরণ, অন্নপূর্ণা দেবী এবং নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে তিমিরবরণ এবং আলি আকবরের বোন অন্নপূর্ণা দেবী অসামান্য প্রতিভাশালী হলেও এঁদের বাজনা কোনো - না - কোনো অপ্রীতিকর কারণে আজ হারিয়ে গেছে। আমাদের প্রজন্ম এই সমস্ত শিল্পীর বাজনা শোনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে--এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কিছুই হতে পারে না। কোনো এক অজ্ঞাত (?) কারণে তিমিরবরন বা অন্নপূর্ণা দেবীর রেকর্ড পাওয়া যায় না। মাইহার ঘরানার শিল্পীদের মধ্যে আমরা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সম্পর্কে সরোদ বাদনের অধ্যায়ে আলোচনা করবে। আপাতত পণ্ডিত রবিশংকর এবং পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যেপাধ্যায়ের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যাওয়া যাক।

রবিশংকর

চলমানতা এবং নমনীয়তা যে শিল্পেরই basic feature হওয়া উচিত। রবিশংকর এই দিকটার ওপরই জোর দিয়েছেন বারবার। তাঁর বাজে যে দাক্ষিনাত্যের 'কর্ণাটকী' স্টাইল বা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়--তা একান্তই যেন পণ্ডিত রবিশংকরকেই চিনিয়ে দেয়। রবিশংকরকে আমার এতোটাই experimental মনে হয় যে ওঁর বাজনা শোনার সময় আমাকে সদাসর্বদা অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়। বিলম্বিতে বীণের আলাপে ওঁর রাগবিস্তারে radical approach নানা চিত্র - বিচিত্র টুক্‌রো কাকাজ, এবং অসামান্য phrase ও idiom এর বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আনাগোনার জন্য স্বাভাবিকভাবেই রবিশংকরের বাজনা সাধারণ শ্রোতার কাছে জটিল এবং দুর্বোধ্য বলে বোধ হয় আসলে আমার কেবলই মনে হয় রবিশংকরের সেতার শোনা আর আধুনিক কবিতা পড়া--অনেকটাই এক। দুটোতেই অত্যন্ত মনয়োগ এবং ভালোবাসা না থাকলে 'মূর্তি হৃদয়ঙ্গম হয় না', অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ চলাচল সম্ভব নয়। একটি phrase - এর ব্যবহার, অল্প একটু paragraph এর রং ছোপানো --তেই মনে হয় যেন সাক্ষাৎ রাগিনী বাজনার তারগুলো থেকে বেরিয়ে এসে একদম সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এই 'বেরিয়ে এসে দাঁড়ানো'কেই ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মনে এলো' নামক বইতে 'আধুনিক আর্টের একটি প্রধান লক্ষণ' হিসেবে দেখেছেন।... রবিশংকরের নিজে সৃষ্ট রাগগুলো, যেমন 'হেমন্ত', 'রসিয়া', 'আহীর ললিত', 'ইমন মঞ্জ', 'তিলক শ্যাম'--সব কটিই ভীষণ সুন্দর এবং ওঁর জীবনের প্রথম দিকের রেকর্ডে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে পণ্ডিতজীর রেকর্ড পাওয়া যায় 'নট্‌ ভৈরব', 'মারওয়া', 'পুরিয়া কল্যাণ', 'ইমন কল্যান', ইত্যাদি রাগে। তবে আমাকে যদি পণ্ডিতজীর বাজানো রাগগুলিরমধ্যে প্রথম দশটি বাছতে বলা হয়, তবে তা এরকম হবে---

ইমন মঞ্জ দেবগিরি বিলাবল হেমন্ত

খামাজ সামন্ত্‌ সারং রসিয়া

ললিত দেশি নট্‌ ভৈরব এবং শুদ্ধ কল্যাণ।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র ৫৫ বছর বয়সে এই শিল্পীর অকালমৃত্যুতে গোটা সঙ্গীত জগৎ হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে যায়। সম্পূর্ণ সঙ্গীতের আবহাওয়ায় পুষ্ট এক পরিবারে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৯৩১ সালে। খুব অল্প বয়স থেকে পিতা জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সেতারের হাতেখড়ি এবং এক 'বিস্ময় বালক' হিসেবে মাত্র ৯ বছর বয়সে 'নিখিলবঙ্গ সেতারপ্রতিযোগিতা'য় প্রথম স্থান অধিকার--সেই শু, তারপরে আর আটকে রাখতে পারা যায়নি নিখিলকে। গৌরীপুরেরমহারাজা মুগ্ধ হয়ে যান নিখিলের সেতার শুনে এবং তিনিই নিজের চেষ্টায় পণ্ডিত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীকে রাজী করান বালক নিখিলকে তালিম দেওয়ার ব্যাপারে। এই বীরেন্দ্রকিশোরের হাতেই নিখিলের জন্মগত প্রতিভার প্রকৃত বিকাশ হয়--যার সম্পূর্ণ স্ফুরণ ঘটে যখন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় মাইহার ঘরানার কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব বাবা আলাউদ্দিন খাঁর ছত্রছায়ার আসনে। ৬ বছব নিখিলের সুযোগ হয় আলাউদ্দিন খাঁর কাছে বসে কঠোর রেওয়াজ করার ও ওস্তাদকে শোনা। এরপর ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ -- এই চারবছর নিখিল আসেন সৃজনী প্রতিভার আরেক অসামান্য ব্যক্তিত্ব--ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সংস্পর্শে। এই সরোদগু যথেষ্ট প্রভাব পড়ে নিখিলের শিল্পীজীবনে এবং তাঁর প্রখ্যাত 'বাজ'-এ। পরে আলি আকবরের সাথে নিখিল সরোদ ও সেতারের যুগলবন্দীতে রেকর্ডও করেন--যা আজ অনবদ্য landmark হয়ে আছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে। 'মিউজিক টুডে' থেকে প্রকাশিত এই যুগলবন্দীর রেকর্ডটি পাঠকদের কিনে ফেলতে অনুরোধ করি --যাতে এই দুই শিল্পীর বাজনার জুড়িতে ফুটে উঠেছে দুই মিশ্র রাগ--মা-জ খামাজ এবং মিশ্র মাণ্ড। যাইহোক যা বলছিলাম। আলি আক্‌বরের মিউজিক কলেজে (ক্যালিফোর্ণিয়া শহরে স্থাপিত) নিখিল এরপর নিয়মিতভাবে বাজাতে শু করলেন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নিখিলেনর প্রতিভা প্রতিষ্ঠা পেলো শ্রোতার হৃদয়ে। এভাবে রবীন্দ্রভারতী ঝিবিদ্যালয় এবহ ঝিভারতী ঝিবিদ্যালয়ের সাথেও তাঁর নাম ও বাজনা জড়িয়ে গেল। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে American Society for Eastern Arts (ASEA) -এর 'দ্দন্দ্বন্দ্ধন্ড্ধ ত্নজ্ক্সন্দ্রন্দ্বন্দ্বক্সজ্ঞ ক্সন্দ্র ত্তত্ত্বন্দন্ত্ত' পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে নিখিলের সঙ্গীতজীবনের অন্যতম

উজ্জ্বল ঘটনা হলো--বাবা আলাউদ্দিন খাঁর অসামান্য প্রতিভার অধিকারী কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীর তত্ত্বাবধানে সেতারের তালিম। এই অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গেই পরবর্তী কালে পণ্ডিত রবিশংকরের বিবাহ হয় এবং কোনো এক দুর্ভাগ্যজনক কারণে ওঁকে সেতার বাজানো ছেড়ে দিতে হয়। তবে উনি নিখিলকে খুব যত্ন নিয়ে শেখাতেথাকেন এবং মনের মতো করে তৈরি করে দেন নিখিলের স্বতন্ত্র style । যে style এ আমরা যেমন পাহ ওস্তাদ আলাউদ্দিনের বিশুদ্ধতা, আলি আক্‌বরের গভীর জীবনদর্শন, তেমনি পাই অন্নপূর্ণা দেবীর অকৃত্রিম classical approach এর ছোঁয়া। এই বাজ-এ মেশে ওস্তাদ আমীর খাঁর lyrical গায়কী অঙ্গ্‌ -- যা খুব স্বাভাবিক ও সাবলীলভাবেই ঘটে, কারণ নিখিল নিজে আমীর খাঁর গায়কীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তবে এ সবের উর্ধে অবশ্যই ছিলো শিল্পীর নিজস্ব expression এবং নির্ভূল রাগ বিস্তার নিজে লাজুক এবং অন্তর্মুখী প্রকৃতির মানুষ হলেও তাঁর হাতে সেতার যেন কথা বলতো। ভারত সরকারের পদ্মশ্রী, ১৯৪৭ সালে পাওয়া সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুস্কার, তারপরে পদ্মভূষণ --এসব দিয়ে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত সঙ্গীতজীবনে যতোটা প্রচার এবং খ্যাতি পাওয়ার কথা -- তা শিল্পী পেয়েছিলেন কিনা--এ প্রশ্নের জবার দিতে গেলে কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গে যেতে হয়--সে বিতর্কে না যাওয়াই ভালো। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পিলু' বা 'আড়ানা'র মতো রাগ বাজালেও মূলতঃ গম্ভীর প্রকৃতির রাগই তাঁর হাতে বেশি খুলত, --করণটা সহজ - রাগবিস্তারের বিলম্বিত আপাপে এখনো তাঁর সমকক্ষ সেতারিয়া খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে সব মিলিয়ে নিখিলের যে কয়েকটি রাগ না শুনলেই নয়, তা হলো--

মেঘ ললিত আসাবরী জৌনপুরী
সিন্ধুড়া সোহিনী হেমন্ত্‌ ভাটিয়ার
পুরিয়া মিশ্রগারা মিয়াঁ কি তোড়ি খামাজ
শিবরঞ্জনী হংসধবনি দেশ

৩. ইম্‌দাদখাণী ঘরানা
সেতার ঘরানার অপর একটি নাম অবশ্যই ইম্‌দাদখানী ঘরানা--যা বর্তমানে ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর সেতারের জন্য বিখ্যাত। এই ঘরানাও ধ্রুপদের পরবির্তে সেতারে খেয়াল অঙ্গ বাজিয়ে থাকে। এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য হলো, এই ঘরের 'বাঁ হাতের বাজ্‌'--যাতে melody ও তার continuity -র জন্য দায়ী বাঁ হাতের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। স্বভাবতই এই ঘরানা বাজে যে melody ও continuity পাওয়া যায়--তা অন্য ঘরানার থেকে একে অনেকটাই আলাদা করে রেখেছে। বলা বাহুল্য, এই ঘরানার সেতার অনেক বেশি মিষ্টি ও সুখশ্রাব্য -- যার সুরের ধাক্কা যে কোনো ধরণের শ্রোতাকে যে কোনো সময়ে ধরাশায়ী করতে যথেষ্ট। এ কথাও এখানে বলে রাখি যে, সেতার যন্ত্রটিকে নিয়ে যে ক'টি technical পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজ পর্যন্ত হয়েছে--তার অধিকাংশই ঘটেছে এই ঘরানার তত্ত্বাবধানে। যেমন মজবুত 'তব্‌লী'র প্রয়োগ, উন্নত 'ব্রিজ' -এর উদ্ভাবন, নতুন তারের সংযোজনের পাশাপাশি পুরনো তারগুলির পুনঃসংস্থাপণ, এমনকী মূল fret-work -এরও প্রভূত পরিবর্তন সাধন করা হয় এই ঘরানাতেই। স্বভাবতই এই পরিবর্তন গুলি এই ঘরানার সেতার বাজকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে, -- গুণগত দিক থেকে পরিবেশনের ক্ষেত্রে এই উৎকর্ষ সাধন আজো হয়ে চলছে, যা এই ঘরানার উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে, এ কথা বলা যায়। এই ঘরানার প্রকৃত নাম হলো 'ইত্তাওয়া' ঘরানা। সেতারের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী ইমদাদ খাঁর নাম অনুসারে এর নামহয় 'ইমদাদখানী ঘরানা'। ইমদাদ খাঁর বংশ পরম্পরায়, একের পর এক প্রতিভাবান সেতারিয়ার আগমনে এই ঘরানা সমৃদ্ধ। ইমদাদ খাঁর পুত্র ইনায়েৎ খাঁ, ইনায়েতের দুই পুত্র বিলায়েৎ ও ইমারত হুসেন, আবার বিলায়েৎ খাঁর পুত্রসুজাৎ হুসেন --এইভাবে এই ঘরানার সুপ্রাচীন ধারা আজও প্রবাহিত। সেতার ধরার পদ্ধতি থেকে শু করে বসার ভঙ্গি এবং বিদ্যুতের মতো তানের গতিশীল চলনে--এ ঘরানা সবসময়ই ওক স্বতন্ত্র ছাপ বহন করে, যা এক কথায় অননুকরণীয়। এ প্রসঙ্গে ওস্তাদ ইমদাদ্‌ খাঁ এবং ওস্তাদ ইনায়েৎ খাঁর কথায় খানিকটা আসা যাক। ইমদাদ্‌ খাঁর জন্ম হয় উত্তরপ্রদেশের উত্তাওয়া গ্রামে ১৯৪৮ সালে এবং মৃত্যু ১৯২০ -তে। এই দীর্ঘ সঙ্গীতজীবনে ইমদাদ্‌ খাঁ সাহেব নিজের 'বাজ' গঠনের পাশাপাশি সেতার যন্ত্রটিতে বীনা, রবার, সারেঙ্গী ও পাখোয়াজের 'তোড়া', 'টুকরা' এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অঙ্গেরও উদ্ভাবন করেছিলেন। এইচ. এম. ভি. থেকে আজ থেকে ৫/৬ বছর আগে প্রকাশিত 'চেয়ালম্যানস্‌ চয়েস্‌' সিরিজের ক্যাসেটে ইমদাদ্‌ খাঁর ১৯০৫ ও ১৯১০ সালের রেকর্ডিং পাওয়া যায়, তাতে আছে--
ভৈরব জৌনপুরী
জৌনপুরী তোড়ি বেহাগ
কাফি সোহিনী
খামাজ দরবাড়ী কানাড়া
ওই একই ক্যাসেটে 'ইমদাদখানী' ঘরানার আর এক কিংবদন্তী শিল্পী ওস্তাদ ওনায়েৎ খাঁর রেকর্ড করা সেতার, সুরবাহার ও সুরসপ্তকের রসাস্বাদন করা অবশ্যই এক দুর্লভ স্মৃতি
সেতার -- য়েগিয়া ভৈরবী পিলু বিহারী
সুরবাহার -- পূর্বী বাগেশ্রী
সুরসপ্তক -- খামাজ

বিলায়েৎ খাঁ
বিলায়েৎ খাঁর দুর্ভাগ্য -- ওঁর যখন খুব অল্প বয়স, তখন বাবা ইনায়েৎ খাঁর মৃত্যু হয়। সে বয়সে বাবার মৃত্যু হয়, তখন বালক বিলায়েৎ ঘুরি ওড়াচ্ছিলেন। এতো অল্প বয়সে বাবাকে হারানোর ফলে বিলায়েৎ পিতার কাছে প্রায় কিছুই তালিম পাননি বলা চলে। ইনায়েৎ খাঁর একদম শেষ বয়সে বিলায়েতের 'গাণ্ডা' বাঁদা হয়, কিন্তু তার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ইনায়েৎ খাঁ চলে যান এবং সেই সঙ্গে সেতারের প্রায় একটি যুগের অবসান হয়। তবে বিলায়েৎ তাঁর পৈতৃক ও মাতুল বংশের সাহায্যে এবং নিজের অপরিসীম চেষ্টায় ও অক্লান্ত রেওয়াজের পর হয়ে উঠলেন বিলায়েৎ খাঁ --এই শতাব্দীর অন্যতম প্রধান যন্ত্রশিল্পী। ইমদাদা - ইনায়েৎ খাঁর বংশের যোগ্য উত্তরসূরী বিলায়েৎ খাঁকে চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় 'মেলোডি'র জাদুকর। বাঁ হাতের পাঁচটা আঙ্গুল দিয়ে মাঝের স্টীলের তারটিকে নিয়ে তিনসপ্তকে যে-কোনো সুরে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত মায়ামোহের জাল বিস্তার করতে বিলায়েতের মতো অন্য কাউকে শুনিনি। যারা প্রথম যন্ত্রবাদন শোনা শু করবে--তাদের প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত অবশ্যই বিলায়েতের সেতার। এর কারণ -বিলায়েতের 'বাজ'-এ এক ধরণের অকৃত্রিম lyricism পাওয়া যায়। যা অনেকটা 'কিরানা'র স্টাইলের সঙ্গে মেলে-এই lyrical touch কে অস্বীকার করা যে কোনো শ্রোতার পক্ষেই এক রকম অসম্ভব। কিরানা গায়কীর মেদুরতা, সাবলিতা--

এ সবই বিলায়েতের বাজনায় পাওয়া যায়, কারণ বিলায়েৎ নিজে কিরানার আবদুল করিম খাঁর একজন বড়ো ভক্ত। ওঁর দ্রুত তানে ফৈয়াজ খাঁর ছোটো খেয়ালের সাদৃশ্য পাওয়া যায় বেশি। উচ্চ গ্রামে পৌঁছে বিশুদ্ধ 'চিকারি'র প্রয়োগ এবং সর্বোপরি অনাবিল সাবলীলতায় দুগুনি-চৌগুনি স্পিডে তানবাজিতে বিলায়েতের প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আর এখানেই বিলায়েৎ স্বতন্ত্র, যদিও তিনি ইচ্ছে করলে পিতা ইনায়েৎ খাঁর 'বাজ' বাজাতে পারেন, এবং গৎকারীর সময়ে বাজনাও তবে সেতারের ওপর বিলায়েতের দখল এবং এই যন্ত্রে গায়কী অঙ্গবাজানো--প্রায় প্রবাদবাক্যের মতো। কৈশোরে বিলায়েৎ ১৯৪৪ সালের যে কনফারেন্সে বানিয়ে সর্ব প্রথম বিখ্যাত হন--সেই অনুষ্ঠান থেকেই তৈরি হয়ে যায় 'ইত্তাওয়া' ঘরানার এক নিজস্ব এবং ধারাবাহিক ঐতিহ্যের পরিবহন। 'আলাপচারী'র ক্ষেত্রে বিলায়েতের অসাধারণ imaginative approach যা প্রায় একটি 'ম্বাপ্সন্দ্বব্ধনন্ত ন্দ্বব্দব্দ্ভ্রন্ত' র মতো আমাকে অনেকবার চরম সুখের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। 'ঝালা' ংশে ওঁর দক্ষতা--সেই আমেজকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এই বিশেষ গুণটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন বিলায়েতের সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং রবিশংকর। পণ্ডিতজী তাঁর 'রাগ অনুরাগ' -এ বিলায়েতের এই 'বাজকে' /ন্তুপ্সপ্সন্ত্বব্ধনপ্স্ব প্সন্দ্র ভ্জপ্সপ্সন্ত্বব্ধনন্তনব্দপ্পক্রন্ত ত্ত্বপ্সন্ত্রন্তভ্ঙ্* হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

১৯২৪ সালে বিলায়েরে জন্ম হয় বাংলাদেশের গৌরীপুর গ্রামে। মুঘল আমল থেকে শু করে এই 'ইত্তাওয়া' ঘরানায় যে সেতারিয়াদের ধারা প্রবাহিত তার মধ্যে বিলায়েৎ ষষ্ঠস্থানে আছেন। আর এ কথা বোধহয় সবাই এক বাক্যে মেনে নেবেন যে, জটিল থেকে জটিলতর রাগের রূপায়ণে এবং ওঁর একান্ত নিজস্ব সপাট তানে বিলায়েতের প্রতিদ্বন্দ্বী এই ভূ-ভারতে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ওঁর বাজনায় যে 'গায়কী অঙ্গ' পাওয়া যায় তাতে ঠুংরী এমনকী ধুনের পরিচয়ও মেলে ---যা বিলায়েৎ খাঁর অসম্ভব রোমান্টিক ও নমনীয় style এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিলায়েৎ খাঁর বাজানো কয়েকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সৃষ্টি----

খামাজ আল্হাইয়া বিলাবল দরবারী কানাড়া
আহীর ভৈরব সিন্দু ভৈরবী বাহার
পুরিয়া পূর্বী গারা
ইম্রাত হুসেন খাঁ
এঁকে বিলায়েৎ খাঁর ভাই হিসাবে অনেকেই হয়তো চেনেন, তরে অনেকেই জানেন না যে, বর্তমানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দুনিয়ায় বিচক্ষণ, বিদ্বষক এবং পণ্ডিত শিল্পীদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইনি 'ইত্তাওয়া' ঘরানার সেতার ও সুরবাহারের যাবতীয় উপাদন নিজের মধ্যে আত্মীকৃত করেই থেমে থাকেন নি, সেই গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে ইম্রাত হুসেন প্রাচীন কণ্ঠসঙ্গীতের ধারাকে মনোযোগের সাথে অনুধাবন করেছেন এবং নিজের বাজনায় তার রূপ প্রকাশ করেছেন সম্পূর্ণ এক নতুন মাত্রার সঙ্গে। ইমরাত হুসেনের তালিম প্রায় পুরোটাই আসে দাদা বিলায়েৎ খাঁর কাছ থেকে। বিলায়েৎ খাঁ নিজে চাচ া বহীদ খাঁ সাহেবের কাছে সুরবাহারের তালিম পেয়েছিলেন, কিন্তু এই যন্ত্রটির সম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়েছিলেন ভাই ইমারত হুসেনকে-- যাঁর সুরবাহারে নির্ভূল আলাপচারী পিতা ইনায়েৎ খাঁকে মনে করিয়ে দেয় বারবার ইম্রাত হুসেনের রেকর্ডে (এইচ. এম.ভি. ও মিউজিক টুডে) পাওয়া যায়---
সুরবাহার--- মিয়াঁ কি মল্লার, শ্যাম কল্যাণ, ইমন কল্যাণ, বাগেশ্রী
সেতার--- রাগেশ্রী, গাবতী।
বিলায়েতের বংশের লোক, অথচ মামু বিলায়েতের বাজনা পছন্দ করেন না ওস্তাদ রাইস্ খাঁ। ইনি অধুনা পাকিস্তানে পাকাপাকিভাবে বসবাস করছেন। ইনি যতোই বিলায়েৎকে প্রকাশ্যে গালিগালাজ কন, নিজে বাজিয়ে থাকেন বিলায়েৎ খাঁরই গাৎকারী। এঁর রেকর্ডে পাওয়া যায়---
দরবারী কানাড়া মারওয়া
তিলক কমোদ মিয়াঁ কি তোড়ি
ঝিঝোঁটি ভৈরব

বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায়
বিলায়েৎ খাঁর সুন্নী শাগীরদ্দের মধ্যে অন্যতম। নিজে ইমদাদ্খাণী ঘরানায় জন্মগ্রহণ না করেও বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায় যে অনায়াস দক্ষতার সঙ্গে ইমদাদখাণী বাজের দখল রেখেছেন -- তা এক কথায় অভূতপূর্ব। আর এর পেছনে শিল্পীর নিজের প্রতিভা তো আছেই, তবে সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্বের দাবীদার পণ্ডিত বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'তৈয়ারি'র ব্যাপারে ওর সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে বুধাদিত্যর জুড়ি পাওয়া ভার--যা ওঁর ঝালা অংশে প্রচণ্ড গতির তানে ভীষণভাবে প্রকাশ পায়। সেতারে 'টপ্পা' অঙ্গের কাজ বাজানো বুধাদিত্য বেশ ভালোভাবেই করে থাকেন। ইমদাদ্ খানী ঘরানার মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ melody র যথাযথ প্রাপ্তি ঘটেছে বুধাদিত্যর বাজনায়। ওঁর যে কটি রেকডিং পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো---
মিশ্র কাফি সোহিনী ইমন কল্যাণ রাগেশ্রী
সিন্ধু কাফি ভূপালী পিলু কাফি
আহীর ভৈরব তিলক কামোদ ইমন কাফি সাহানা

আবদুল হালিম জফ্ফর খাঁ
ইন্দোরের অভিজাত বীণকারদের ঘরানার এই প্রবীন শিল্পীর বয়স বর্তমানে বাহাত্তর বছর। বন্দে আলি খাঁ, মুরাদ খাঁএবং বাবু খাঁর মতো রথী মহারথী এই ইন্দোর - বীণকার ঘরানায় রাজত্ব করেছেন--সেই ঘরানারই যোগ্য উত্তরাধিকারী আবদুল হালিম জফ্ফর খাঁ এই শিল্পীকে সব সময়েই শোনা গেছে নতুন নতুন 'চিজ্' আবিষ্কারের খেলায় মেতেউঠতে সেই সমস্ত innovation যে সবসময় আমার কানে বসে তা নয়--আর তা হয়তো আমার কানেরই দোষ--তবে এই বয়সে এসেও অমন এক রক্ষণশীল ঘরানার মধ্যে থেকে এ হেন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যাওয়া শিল্পীর উদারমনস্কতার পরিচয়ই বহন করে। এই 'জফ্ফর খানী বাজ' কতোটা লোকে নিয়েছে বলতে পারি না, তবে এ কথা ঠিক যে এই শিল্পী না থাকলে 'হিজাজ', 'চম্পাকলি', 'রাজেশ্বরী','শ্যামকেদার', ও'ফরগনা'র মতো রাগ লোকে ভুলে যেতো শিল্পীর নিজের সৃষ্টি রাগগুলি যেমন 'মধ্যমী', 'চত্রধুন', 'কল্পনা', 'সরস্বতী' এবং 'খুশরাওয়ানী' ছাড়াও এঁর বাজানো 'ভীমপলাশী' ও 'বিলা কাফি' --ও বেশ সুখশ্রাব্য। তবে একসাথে তিনটি সেতারে আওয়াজ এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণ ভারতের 'ঘটম্' -এর মতো ঢোলকের শব্দ কানকে কষ্ট দেয়।

স রো দ

সেতারের পাশাপাশি যে যন্ত্রটি সঙ্গীতের আসরে সুপ্রচীন আভিজাত্য বহন করে আসছে, তা হলো--সরোদ। আমরা একটু আগেই সেতারের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত ঘরানা-ভিত্তিক আলোচনা করেছি -- তাই সরোদের ওপর আর বেশি কথায় যাবো না। তবে এটুকু বলে রখি যে, সেতারের তুলনায় ইতিহাসকে সামনে রাখলে সরোদ অনেক পরে এসেছে,এবং এসেছে কারণ তৎকালীন রবাবিয়াদের জনপ্রিয়তা। সে সময়ে সবাই যখন বীনের বাজকে অনুসরণ করে সেতারের দিকে ঝুঁকেছেন, তখন 'রবাব্'--এই যন্ত্রটিকে 'মডেল' হিসাবে রেখে 'সরোদ' যন্দ্রটির গঠন এবং বাদনশৈলীর নির্মাণ--এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বৈকি। তবে সেদিকে না গিয়ে আমরা এবার দেখবো বর্তমান সরোদিয়া ঘরানার দুটিদিক্ এবং তাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যের দিকে। এখন আমরা য়ে সরোদ শুনতে পাই--তার স্টাইল গঠনের ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছিলেন--দুই মহান সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব -- ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ, এবং অবশ্যই বাবা আলাউদ্দিন খং। প্রথমজনের 'গোয়ালিয়র' বাজ এবং দ্বিতীয় জনের 'মাইহার' বাজ -ই বর্তমান সরোদ বাদনের প্রধান দুটি ঘরানা নির্মাণ করে দিয়েছে। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পুত্র আলি আকবর খাঁ এবং হাফিজ আলি খাঁর পুত্র আমজাদ আলি খাঁ এই ঘটনাসূত্রকে ধারণ করে রেখেছেন, --এবং আধুমিক প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে সরোদ জনপ্রিয় হয়ে উঠার জন্য এই দুজনই কৃতিত্ব বহন করেন। কোন শ্রোতার কাছে সেতারের সূক্ষ্ম এবং লিরিকাল চলন ভালো লাগবে, --আবার কোন্ শ্রোতার কাছে সরোদের দৃঢ়, মেলোডি- মাখা 'ঞ্চব্ধজ্ঞপ্সন্সন্দ্বন্দ্রত্তুপ্ত নস্তুনস্পপ্প' ভালো লাগবে--এ বলা খুব কঠিন। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, এই দুটি যন্ত্রই আপামর শ্রোতার মনে সমান গুত্বপূর্ণ জায়গা অধিকার করে নিয়েছে।

আলাউদ্দিন খাঁ

ত্রিপুরার পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম শিবপুরে জন্ম এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের। দশ বছর বয়স থেকে ঘর ছাড়া এই মানুষ নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য বেছে নেন সঙ্গীতকে। সঙ্গীত হয়ে ওঠে খাঁ সাহেবের সাধনা ও মুক্তিলাভের উপায়, 'মাইহার' হয়ে ওঠে 'বাবা'র কর্মভূমি। পদ্মবিভূষণ এই কিংবদন্তী শিল্পী শুধু সরোদ দক্ষ ছিলেন বলা ভুল হবে, এঁর সরোদ ছাড়াও অন্যান্য নানারকম যন্ত্রের বাদনে দক্ষতার জন্যে এঁকে 'সর্বযন্ত্রবিশারদ' এই উপাধি দেওয়া হয়। বাবা আলাউদ্দিনের সরোদে ললিত তিলককামোদ আসাবরী বেহাগ দেবগিরি বিলাবল গারা ভৈরবী জয়জয়ন্তী --কোনো বিশেষণের অপেক্ষা রাখে না। সেরকমই চমৎকার বেহালায় -- সিন্দুড়া, বেহাগ, খামাজ, মালগুঞ্জি, এবং অবশ্যই বাংলা কীর্তনের সুর।

আলি আক্বর খাঁ

পিতা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের হাতে গড়া প্রায় অর্ধ- শতাব্দী জুড়ে থাকা ঘরানাকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার পাশাপাশি 'মাইহার' শৈলীকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে সমান খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করা--এই দুটি দায়িত্বই একসঙ্গে সামলেছেন ওস্তাদ আলি আক্বর খাঁ। বাবার গ্রাম শিবপুরেই (অধুনা বাংলাদেশে) ১৯২২ সালে আলি আকবরের জন্ম। তিন বছর বয়স থেকেই আলি আক্বরের তালিম শু হয়, --আর সবচেয়ে আশ্চর্যের সে সময় বাবা ওঁকে শুধু গানের তালিমই দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য পিতার কাছে সরোদের তালিম নেওয়া শু হলো--সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যন্ত্রেরও। ন'বছর বয়স থেকে শু হয় কঠোর অনুশীলন--একদিন প্রায় আঠারো ঘন্টা ধরে চলতো নিয়মিত অভ্যাস। চোদ্দ বছর বয়সে আলি আকবর প্রথম বাজান এলাহাবাদের একটি অনুষ্ঠানে। সেই সময়েই ইনি যোধপুরের মহারাজের দরবারে নিয়মিত বাজানোর সুযোগ পান। পরবর্তীকালে রামপুরের ওস্তাদ বজীর খাঁর কাছেও আলি আক্বর সেনিয়া ঘরানার তালিম পান। আলি আক্বর খাঁই প্রথম শিল্পী যিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকেআমেরিকা, যুরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, কানাডা এবং অন্যান্য অঞ্চলে নিয়ে যান। ১৯৫৫ সালে ইহুদী মেনুহিনেরঅনুরোধে খাঁ সাহেব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যান এবং নিউ ইয়র্ক শহরে অবস্থিত আধুনিক শিল্পের একটি মিউজিয়মে প্রথম বাজান। প্রথম ভারতীয় সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর এল.পি.রেকর্ড প্রকাশিত হয় এবং অ্যালিস্টার কুকের 'অমনিবাস'-এ ওঁর বাজনা টেলিভিশনে প্রচারিত হয় এই সময়েই। ১৯৬৭ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ার সান রাফায়েলে স্থাপিত হয় Ali Akbar College of Music --যেখানে আজো প্রায় আট হাজারেরও বেশি ছাত্র সঙ্গীত শিখতে আসেন। তবে তারও আগে' ৫৬-তে কোলকাতায় স্থাপিত হয়েছিলো Ali Akbar College of Music । সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী', তপন সিংহের 'ক্ষুধিত পাষাণ' -এর মত ছবিতে খাঁ সাহেবে সঙ্গীত সৃজন মূল্য চিত্রনাট্যে এক অপূর্ব মাত্রা এনে দিয়েছিলো, এ কথা সবাই স্বীকার করে নেবেন। আলি আকবরের নিজের সৃষ্ট রাগগুলি যেমন 'চন্দ্রনন্দন', 'লাজবন্তী', 'মালয়ালম্', 'ভূপ-মাণ্ড্', 'মাধবী', 'গৌরীমঞ্জরী'... ইত্যাদি শুনলে যেন মনে হয় বিশাল এক উচ্চতা থেকে ভীষণ সুন্দর মহাকাল, রাগ ও লয়ের মাধ্যমে রহস্যময় সৃষ্টিকে গল্প বলছে। সরোদকে নিয়ে এতো পরীক্ষ-নিরীক্ষা করতে অন্য কোনো শিল্পীকে তেমনভাবে শোনা যায়নি। নানারকম ঞ্চপ্স্ত্রপ্ত স্মত্রঞ্চঞ্চন্দ্বজ্ঞ -এর জানলা খুলে, হরেকরকম উৎসমুখকে কাজে লাগিয়ে খাঁ সাহেব সরোদকে যে জায়গায় নিয়ে গেছেন--তা অনেক প্রজন্ম ধরে মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করবে। খাঁ সাহেবের আসল কৃতিত্ব বোধহয় সাধারণ শ্রোতার মন জয় করায়--সেখানে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, সঙ্গীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার, পদ্মভূষণ, রবীন্দ্রভারতী থেকে পাওয়া ডক্টরেট, ম্যাকাআর্থার জিনিয়াস অ্যাওয়ার্ড, ১৯৭০, '৮৩ এব, '৯৭ -তে পাওয়া গ্রামি অ্যাওয়ার্ড--এসবই বোধহয় কিছু না। শ্রোতার ভালোবাসার আলোয় এ সমস্ত পুরস্কার ঝাপসা হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে আলি আকবর খাঁকে 'স্বর সম্রাট' উপাধি দেওয়া হয়েছে,--আর সেটি দিয়েছেন ওঁর পিতা এবং গু আলাউদ্দিন খাঁ স্বয়ং। আলি আকবরের বাজানো অগুনিত রাগের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বাছাই করা এক প্রকার দুঃসাধ্য কাজ, তবু একবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মালকোঁষ ভৈরবী ভূপালী তোড়ি নট্ ভৈরব
খামাজ আসাবরী আহীর ভৈরব জয়জয়ন্তী
ভীমপলাশী যোগ দরবারী কানাড়া বিলাসখাণী তোড়ি
চন্দনন্দন দুর্গা চন্দ্রকোষ দরবারী তোড়ি
আলি আকবর খাঁর সাথে রবি সংকরের যুগলবন্দী নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক সৃষ্টি, যাতে পাওয়া যায়--
শ্রী সিন্ধুকাফি সিন্ধু ভৈরবী
খামাজ দুর্গা পলাশ কাফি এবং
বিলাসখাণী তোড়ি।

তবে, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারের জোড়ের সাথে যখন খাঁ সাহেবের সরোদের অবিস্মরণীয় লয়কারি মিলে যায়--তখন জন্ম নেয় এক সম্পূর্ণ অন্য মাত্রায় যুগলবন্দী --যা আগে কখনো শোনা যায়নি, এমন। এক যুগলবন্দীতে 'মাঞ্জ খামাজ' এবং 'মিশ্র মাণ্ড্'-এই দুটি রাগেই পাওয়া যায়। কেন যে আমরা গু - শিষ্যের যুগলবন্দীর বেশি রেকর্ড পাইনা, তার কারণ বলতে গেলে বেশ কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গে যেতে হয়, যেতে হয় সঙ্গীত জগতের কিছু নোংরা রাজনীতির কথায়--যা নিয়ে স্বয়ং খাঁ সাহেবেরও ক্ষোভ নেহাৎ কম ছিলো না। কিন্তু সেই অপ্রিয় সত্যে না যাওয়াই বোধহয় ভালো।

আমজাদ আলি খাঁ

আমজাদ আলি খাঁর সরোদে 'টোনাল কোয়ালিটি' এত স্বচ্ছ, আর সুর এতো কিল্‌বিলে হয় যে কতোবার এই ঘোরের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছি--তার হিসেব নেই। যারা প্রথম গান বাজনা শোনা শু করছে--তাদের প্রথম পছন্দ হিসেবেআমজাদের সরোদ হলে আপত্তির কিছু অন্তত নেই। ভালোই হয় বরং --প্রেমের ঘুড়ি গোত্তা খেয়ে ছাদে নামবেই। যে 'সোনিয়া' ঘরানায় আমজাদের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা--তাতে রাজত্ব করে গেছেন তাবড় তাবড় সব শিল্পীরা, যাঁদেরমধ্যে ছিলেন আমজাদের ঠাকুরদা ওস্তাদ নন্নে খাঁ এবং মুরাদ আলি খাঁ। ১৯৪৫ সালের ৯ই অক্টোবর আমজাদ আলি খাঁর জন্ম হয়। এবং খুব অল্প বয়স থেকেই পিতা পদ্মভূষণ হাফিজ আলি খাঁর কাছে তালিম পেতে থাকেন। দশ বছব বয়স থেকে অনুষ্ঠানে বাজাতে থাকেন, এবং মাত্র ১৫ বছর বয়সে সরোদের অন্যতম প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবেপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সরোদের মতো একটি Striking instrument এ দৃঢ় ছোঁয়ার পাশাপাশি সূক্ষ্ম কাকাজের ব্যবহার--আমজাদের বাজনাকে সকলের চেয়ে আলাদা রেখেছে। নতুন কিছু চিন্তা করতে এবং পরীক্ষা - নিরীক্ষার পথে হাঁটতে আমজাদকে প্রায়ই শোনা গেছে, --যার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হলো সরোদের বাজে খেয়াল অঙ্গের সংযোজন। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, আমজাদ আলি খাঁ প্রাচীন সরোদ - বাজকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। ওঁর বিলম্বিত রাগবিস্তারে ধ্রুপদাঙ্গই অনুসৃত হয়, 'ঝালা' অংশে সুর শৃঙ্গারের ওপর নানা বোল চলনের কাজ, বীণের প্রচলিত বোলবাঁট্‌ --এ সবই পাওয়া যায় আমজাদ আলি খংার বাজনায়। তাঁর অত্যন্ত মেলোডিয়াস্‌ উপস্থাপনা, সুস্থ ও সুচিকরপরিবেশন এবং আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব দেশে এবং দেশের বাইরে প্রচুর খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছে। ১৯৬৫ সালে 'প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি' তাঁকে 'সরোদ সম্রা্ট' -এর উপাধি দেয়, এছাড়া '৭৫ -এ আমদাজ আলি খাঁ ' 'পদ্মশ্রী' খেতাব পান। মাত্র ২৬ বছর বয়সে প্যারিসের একটি আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সংস্থা খাঁ সাহেবকে UNESCO পুরস্কারে ভূষিত করে। গৎকারীতে আমজাদের বাজানো খেয়াল অঙ্গ্‌ --কখনা বা ঠুংরী অঙ্গ্‌ -- বর্তমানে কিংবদন্তীতে পরিণত। রঙিন এখারা তান, বণময় 'ঝালা' এবং আলাপ -এর গভীরতায় --আজজাদ আলি খাঁ আজ ভারতের সর্বকালের সেরাসঙ্গীত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম।

আমার নিজের শোনা খাঁ সাহেবের বাজানো প্রথম দশটি সেরা রাগ হলো।
দরবারী কানাড়া কিরওয়ানি বেহাগ
মিয়াঁ কি মল্লার দুর্গা পলু
তিলক কামোদ সাহানা রাগেশ্রী এবং ললিতা গৌরী।

বেহালা / সারেঙ্গী / এস্রাজ

বেহালা যন্ত্রটির অধিকতর ব্যবহার পাশচাত্য সঙ্গীতেই শোনা যায়, তরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতে এর স্থান অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের চেয়ে কর্ণাটকী বা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে আবার ব্যবহারিক দিক থেকেবেহালার কদর অনেক বেশি। এর কারণ বোধহয় রাগদারী নয়, এর কারণ কর্ণাটকী সঙ্গীতে 'বোয়িং'--এর ব্যবহার অত্যন্ত জোরালো। দক্ষিণের সাংঘাতিক সব বেহালা বাদকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য--কুন্নুক্কুড়ি বৈদ্যনাথ্‌, লাগগুড়ি জি. জয়রাম্‌, নে. রাজম্‌ প্রমুখ। কুন্নুকুড়ি বৈদ্যনাথের সাতে জাকির হোসেনের যুগলবন্দীতে দক্ষিণী 'হিন্দালম্‌' (উত্তর ভারতে 'মালকোঁষ' নামে যা পরিচিত) এক অপূর্ব সৃষ্টি। লালগুড়ি জি. জয়রামন্‌ বেশ কয়েক বছব আগে ওস্তাদ আমজাদ আলি খাঁর সঙ্গে রেকর্ড করেছিলেন, বেহালা ও সরোদের সেই অভুতপূর্ব যুগলবন্দীতে 'হিন্দোলম্‌' ও 'মোহনম্‌' (উত্তর ভারতীয় 'ভূপালী') সত্যিই বারবার শোনার মতো। সরোদ আর বেহালার যুগলবন্দীতে আমরা পেয়েছি দক্ষিনের এল. সুব্রমনিয়মকে, উনি রেকর্ড করেছিলেন উস্তাদ আলি আকবর খাঁর সঙ্গে। আর এন. রাজম্‌ -এর তুলনা ভদ্রমহিলা নিজেই। এন. রাজম্‌ উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতেও সমান জনপ্রিয়। আর দাক্ষিণাত্যের এম. এস. গোপালকৃষ্ণণের 'বোরিং'-এর কথা তো এখনো শ্রোতাদের মুখে মুখে ফেরে। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে বেহালাবাদক হিসেবে যাঁর নাম সর্বাগ্রে করা উচিত, তিনি হলেন 'গোয়ালিয়র' ঘরানার গজানন রাও যোশী, --যিনি খেয়ালিয়া হিসেবেও সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অনন্ত মনোহর যোশী বা অন্তবুয়ার পুত্র গজানানন রাও যোশী একাধারে গোয়ালিয়র, জয়পুর ও আগ্রা গায়কী গাইতে পারতেন, তেমনি বেহালাতেও ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে মুম্বইয়ের Orient Longman থেকে প্রকাশিত গজানন রাও যোশির বই 'ডডঙ্গভ্র ত্তদ্বপ্পঙ্গজন্ত ক্ষ্রুদ্ব' পড়লে বুঝতে পারা যায়, বেহালা যন্ত্রটিকে নিয়ে শিল্পী কতো স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু নানা অজ্ঞাত কারণে তাঁর বেহালার রেকর্ড বেশি রের হয়নি। গ্রামাফোন কোম্পাণী থেকে শিল্পীর বাজানো যে দুটি রাগ উপলব্ধ তা হলো --'খামাজ' এবং 'হংস কিঙ্কিনী'।

ভি. জি. যোগ

প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে এই শিল্পী নানা স্তরের শ্রোতার মনে জনপ্রিয়তার শিখরে অবস্থান করেছেন। শুধুমাত্র বেহালাবাদক হিসেবে নয়, ভি. জি. যোগ আজ সঙ্গীতেরই অপর এক নাম । অগ্রার অন্যতম সেরা শিল্পী শ্রীকৃষ্ণ রতন্‌জনকরের কাছে ওঁর তালিম শু হয়। এরপর ভি.জি. যোগ শিখতে শু করেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর তত্ত্বাবধানে। ফৈয়াজ খাঁ এব কেসরবাই কেরের মতো দিক্‌পাল শিল্পীদের সঙ্গে নানা সময়ে সঙ্গতও করেছেন। ফৈয়াজ খাঁ ওঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন, এবং ডাকতেন 'ফিড্‌ল ওয়ালা' বলে। ভি. জি. যোগের বেহালা বাজানোর technique একদম ওঁর নিজস্ব -- যার স্বকীয়তা ভীষণভাবে প্রতিফলিত হয় ওঁর গৎকারীর ক্ষেত্রে। --আর 'ঝালা' আর 'লয়কারি'তে পণ্ডিতজীর সমকক্ষ কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। যুগললবন্দীতে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকেন ভি. জি. যোগ। ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁর সানাইয়ের সাথে ভি. জি. যোগেরর বেহালার যুগলবন্দীতে 'ভৈরবী' 'জৌনপুরী' ও'পাহাড়ী'--এক একটি ঐতিহাসিক সৃষ্টি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সাথেও ভি. জি. যোগকে যুগলবন্দী বাজাতে শোনা গেছে। 'শ্যাম কল্যাণ', 'ঝিঝোঁটি'র পাশাপাশি জ্ঞান ঘোষের হারমোনিয়াম ও পণ্ডিতজীর বেহালায় অপূর্ব মাত্রা পেয়েছে 'মিশ্র কালিংগ্রা, বাঁধা বড়ে গোলাম আলির সুবিখ্যাত ঠুংরী ' 'আয়ে ন বালম'। ভি. জি. যোগের নিজের রেকর্ডেপাওয়া যায়--ঝিঝোঁটি, আড়ানা, পুরবী, পাহাড়ী। বেহালার জগতে আরকটি উজ্জবল নাম শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী। ওস্তাদ জাকির হুসেনের অসামান্য সঙ্গতে এঁর বাজানো 'শ্রী' বা 'পলাশকাফি' ঘরানাদার বিশুদ্ধ সঙ্গীতের বিশিষ্ট উদাহরণ।

'বোয়িং' যন্ত্রগুলির মধ্যে অন্য দুটি গুত্বপূর্ণ যন্ত্র হলো সারেঙ্গি এবং এস্রাজ। একটা সময় ছিলো, যখন সারেঙ্গি বাদকদের অত্যন্ত নীচু শ্রেণীর শিল্পীর মর্যাদা দেওয়া হতো। সারেঙ্গি তখন শুধুমাত্র 'তবায়েফ'দের বাজনা। তরে পরে সেই ধারণা পাল্টেছে। ওস্তাদ বুন্দু খাঁ, পণ্ডিত রামনারায়ণ, ওস্তাদ সুলতান খাঁ --এঁরা নিজেদের অসাধারণ শৈলী ও দক্ষতার সাহায্যে সারেঙ্গিকে একক যন্ত্রসঙ্গীতের মর্যাদা দিতে পেরেছেন। সারেঙ্গির মতো কঠিন ও পরিশীলিত বাজনা খুবই কম আছে, তা সত্ত্বেও কেন যে বর্তমানে এই যন্ত্রটির ব্যবহার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে--তা বোঝা যায় না। অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ ও made-up যন্ত্র হারমোয়িামের অত্যাধিক চাহিদাও

এর অবলুপ্তির কারণ হতে পারে। বন্দুখাঁর কথা বলছিলাম। এবং রেকর্ড বিশেষ পাওয়া যায় ন, তরে গ্রামাফোন কোম্পনির পুরনো লাইব্রেরীতে খোঁজাখুঁজি করলে পাওয়া যেতে পারে। 'আকাশবাণী'র সংগ্রহশালায় তো ওঁ রেকর্ড অবশ্যই আছে, তরে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার ইচ্ছে কবে যে 'আকাশবাণণী' দেখাবেন, বলা যায় না। অনেকদিন আগে, মনে আছে, শুনেছিলাম এই আকাশবাণী থেকেই রাতের স্লাটে বুন্দু খাঁর সারেঙিতে রাগ দরবাবী, এবং রাগ মালকোঁষ। সে সুর অ াজো কানে বাজে--রাতের দিকে বিশেষ করে। সারেঙির অন্যতম সেরা শিল্পী রামনারায়ণের কিছু রেকর্ড ও ক্যাসেট অবশ্য রাজারে কিনতে পারা যায়, যার মধ্যে অ াছে -- 'ইমন', 'আসাবরী', 'দেশ', 'পকলি' ইত্যাদি কিছু অসাধারণ রাগ। রামনারায়ণের চেয়ে কম প্রতিভাধর, অথচ বর্তমান প্রজন্মের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয় স ারেঙ্গি বাদক সুলতান খাঁ। এঁর সাথে জাকির হুসেনের সঙ্গতে পাওয়া যায়--বসন্ত, নট্ ভৈরব, মাণ্ড, হেমন্ত।

সারোঙ্গি যন্ত্রটির গঠনশৈলী থেকেই জন্ম নেয় এস্রাজ। এতে 'চিকারি'র প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম। এস্রাজ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিলো, এবং কবিগু ওঁর গানে এস্রাজ ছাড়া অন্য কোনো সঙ্গত পছন্দ করতেন না। এস্রাজের জাদুকর বলা যায় পণ্ডিত অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে --ইনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় রেকর্ডে 'জৌনপুরী' ও 'বেহাগ' পাওয়া যায়--যা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে অসামান্য দুটি রত্ন হয়ে আছে।

বঁা শি

বাঁশি যন্ত্রটির সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার বরিশালের পান্নালাল মাত্র ৪৮ বছর বয়সে অকালে দেহ রাখেন '৬০ সাল নাগাদ।কাঠের বা বাঁশের ফাঁপা এই যন্ত্রটির মধ্যে হাওয়া পুরে. তাতেও যে 'গায়কী' অঙ্গ বাজানো যায়--তা প্রথম দেখান পান্নালাল ঘোষ। এঁর তালিম আসে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে। বঁশির মতো এতটি আপাত সাধ ারণ folk instrument কে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেন পান্নালালই প্রথম। অপেক্ষাকৃত লম্বা আকৃতির বাঁশি নিয়ে পান্নালাল যখন সমাহিত ভঙ্গিতে বাজ াতেন, তখন যে প্রকার আত্মস্থ গম্ভীর এক সুরের মোহজাল সৃষ্টি হতো, তা শ্রোতার হৃদয়ে সরাসরি গিয়ে বিঁধতো। গ্রামফোন কোম্পাণী সম্প্রতি পান্নালালের ছোট রেকডিং গুলো নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে আছে--

চন্দমৌলি বসন্ত মুখরী দরবারি
হংসনারায়ণী ভূপালী তোড়ি ইমন
দীপাবলী খামাজ দাদরা
হংসধবনি পিলু কাজরী।

টি. আর. মহালিঙ্গম

কর্ণাটকী সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশীবাদক হিসেবে টি. আর. মহালিঙ্গম এর নামই করা হয়। খুব অল্প বয়স থেকেই ইনি কনসার্টে নিয়মিত বাজাতে শু করেন। মেলো ডিই মহালিঙ্গমের বাঁশির প্রথম এবং শেষ কথা। রাগদারীতে তো বটেই লয় বা 'জাভা'ওে এঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। এবং বাজনায় এক ধরণের পরম প্রশান্তির আশ্বাস পাওয়া যায়--যা অন্য কোনো শিল্পীর বাঁশিতে এত ভালো করে আমি অন্তত শুনিনি।

বাঁশির দুনিয়ায় আরো দুজনের নাম অবশ্যই করতে হয়--বিজয় রাঘব রাও এবং হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া। পান্নালালেরমৃত্যুর পর বিজয় রাঘব রাও-র থেকে ভালো বাঁশি বাজান এমন শিল্পীকে আমি শুনিনি। এঁর 'হিন্দোল' বা 'ইমন' রাগের বাঁশি যতোবার শুনি, ততোবারই আমার কাছে স্বগীয় বলে মনে হ। চৌরাসিয়া আলি অ াকবরের বোন অন্নপূর্ণা দেবীর ছাত্র, এবং বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভীষণই জনপ্রিয়। তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু বলার আজ আর দরকার পড়েনা। এছাড়া একজন নবীন বাঁশি বাদকের বাজনা অজকাল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, --তিনি হলেন রোণু মজুমদার। এঁর নিজের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের সেতার এবং অ াশিস খাঁর সরোদের সাথে অসাধারণ কিছু যুগলবন্দীর নিদর্শন রাখার পরেও শিল্পী কেন যে ক্রমশ fusion এর দিকে ঝুঁকেছেন--বুঝতে পারি না।

প্রতিশ্রুতি মতো তবলা, পাকোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রের কথায় গিয়ে বক্তব্যকে অনাবশ্যক দীর্ঘ করছি না! বীণা ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতম ধ্রুপদী যন্ত্র হওয়া হত্ত্বেও এর ক্রমশ অবলুপ্তির কারণে এবং বাজারে বীণার ক্যাসেট বা রেকর্ডের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে এই যন্ত্রটির কথা বলা আপাতত মুলতুবি রাখা হলো। সুতরাং বাদ পড়লেন জিয়া মইনুদ্দিন ডাগর, আমজাদ রাজা খাঁ, আবদুল আজিজ খাঁ, চিট্টি বাবুর মতো দিকপাল বীণা বাদকেরা। সানাই এবং এই যন্ত্রের একচ্ছত্র বাদশা ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। খাঁ সাহেবের সুরের ধাক্কায় সুখ-দুঃখ কতোবার যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে --তার কোনো হিসেব নেই। যেখানেই য়ে অবস্থায় শুনেছি এই বিসমিল্লার সানাই--'হাত পেতে নিয়ে চেটেপুটে ' খেয়ে নিয়েছি। সানাইয়ের অবিসংবাদী নায়ক বছর খানেক আগে আর এক মহীরূহ বিলায়েৎ খাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুগলবন্দী বাজিয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন। তবে এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, খাঁ সাহেবের পাশাপাশি আমার অনন্তলালের সানাইও অত্যন্ত প্রিয়। বাকি থাকলো দুটি অপ্রধান যন্ত্রের কথা--গীটার ও সন্তর । গীটারে ব্রিজভূষণ কাব্রা এবং সন্তরে শিবকুমার শর্মা ভালো বাজ াচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু এখনো আমার এই দুটি যন্ত্রকে যথাযথভাবে শাস্ত্রীয় সংগীতের মানচিত্রে অন্তভূক্ত করতে, কেন জানি না, ঠিক মন চায় না। হয়তো এ আমার ক ানেরই দোষ। তবে ঝিমোহন, ভাট্ সম্প্রতি 'মোহনবীণা' নাম দিয়ে যে যন্ত্রটি (মূলতঃ গীটারই) বাজাচ্ছেন--তা বেশ শ্রুতিমধুর। ঝিমোহন ভাটের বিশুদ্ধ রাগদারী মনযোগী শ্রোতার আকর্ষণ কাড়তে বাধ্য।

সবেশেষে জানাই, এ লেখাটি পড়ে কোনো পাঠক যদি সামান্যতম উৎসাহিতও বোধ করেন এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুনতে শু করেন---তবে তাই হবে এই কাজের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার। এই পর্যন্ত এসে, উৎসাহী শ্রোতার স্বার্থে আমার কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের আলাদা, আলাদা দুটি তালিকা দেব--যার প্রত্যেকটি অত্যন্ত বাছাই করা নাম, --এবং এই সমস্ত রেকর্ড / ক্যাসেট দিয়েই শোনা শু করা উচিত বলে আমি মনে করি।

কণ্ঠসঙ্গীত

০১. আবদুল করিম কাঁ
০২. ফৈয়াজ খাঁ
০৩. বড়ে গোলাম আলি খাঁ (খেয়াল ও ঠুংরী)
০৪. আমীর খাঁ

০৫. মল্লিকার্জুন মনসুর
০৬. ডি. ভি. পালুস্কর
০৭. কেসরবাই কেরকর
০৮. হারাবাই বরোদেকর
০৯. ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়
১০. গাঙ্গুবাই হাঙ্গল্
১১. ভীমসেন যোশী
১২. বেগম আখতার (ঠুংরী - দাদরা)
১৩. সিদ্ধেরী দেবী / রসুলন বাই (ঠুংরী - দাদ্‌রা)
১৪. কিশোরী আমুনকার
১৫. রশিদ খাঁ

যন্ত্রসঙ্গীত
০১. বিলায়েৎ খাঁ
০২. রবিশংকর
০৩. নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়
০৪. আলি আকবর খাঁ
০৫. আমজাদ আলি খাঁ
০৬. বিসমিল্লা খাঁ
০৭. পান্নালাল খাঁ
০৮. রাম নারায়ণ
০৯. ভি. জি. যোগ
১০. বিজয়রাঘব রাও।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com